রক্তিম মরীচিকা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

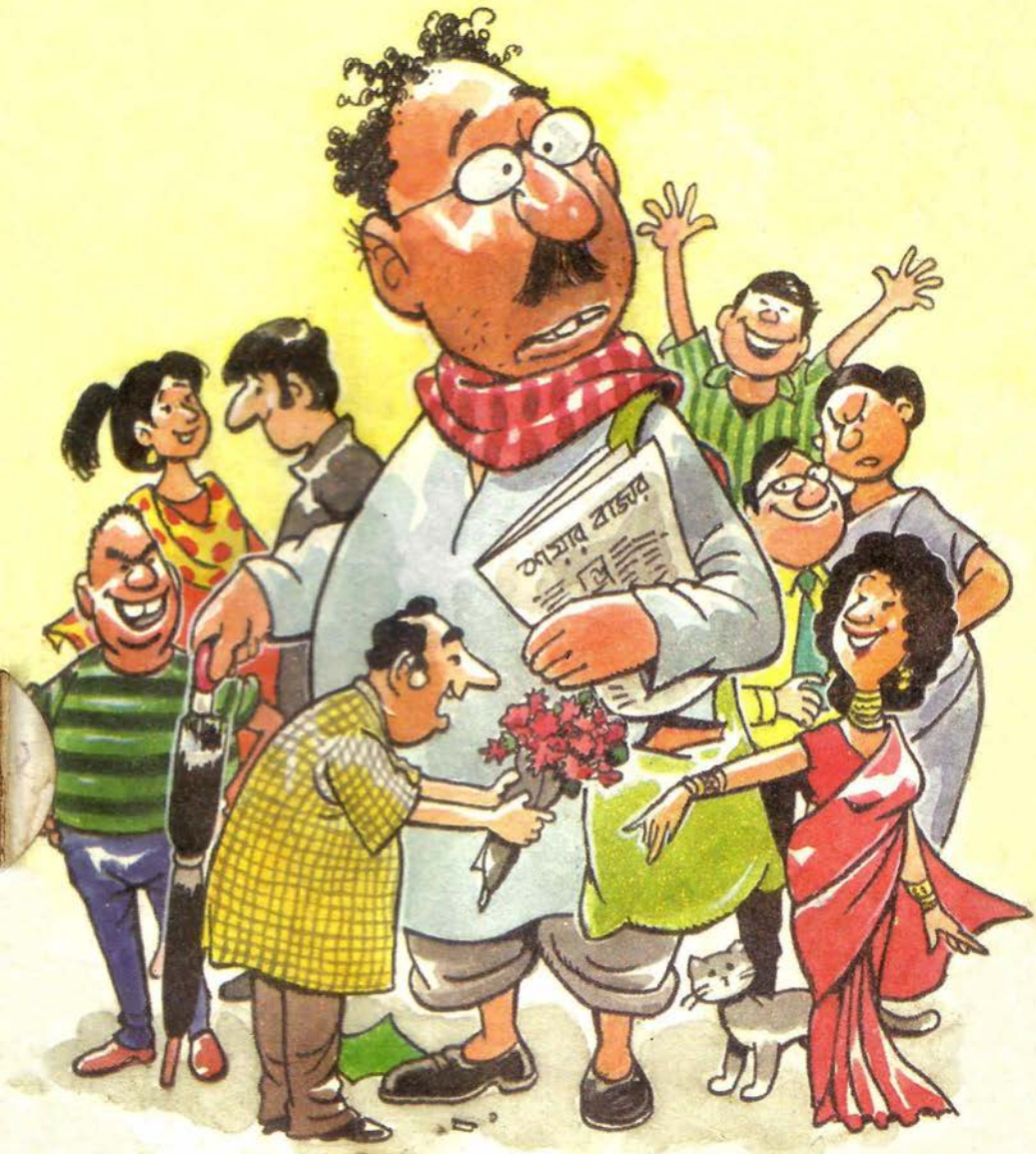

রক্তিম মরীচিকা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রিম পাবলিশার্স
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

RAKTIM MARICHIKA
by *Sanjib Chattapadhyay*

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৩

প্রকাশক
ভোলানাথ দাস
১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
প্রদ্যুৎ সাহা ও প্রণব সাহা
লেজার বাইট
৭, কামারডাঙ্গা রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

প্রচ্ছদ : *দেবাশীষ দেব*

পঞ্চাশ টাকা

আমার পরম আপনজন
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—
স্নেহাস্পদেষু

সূচি

- রক্তিম মরীচিকা ৭
- চোখ ৩৩
- অরণ্যদেবী ৬৭

এক

আমি এই সব কথা খুব সাহস করে লিখে রেখে যাচ্ছি, আমার পরে যারা আসছে তাদের জন্যে। যদি হাতে আসে অবশ্যই পড়বেন। এই জায়গাটার নাম পৃথিবী। পৃথিবী বিশাল বড় একটা জায়গা। আমরা প্রত্যেকেই এক একটা দেশে আসি। সেই দেশের কোনো এক জেলায় যে কোনো একটা পরিবারে আমাদের আবির্ভাব হয়। কিছুকাল থাকার পর আমরা আর থাকি না। গ্রাম্যবাংলায় বলে, পটল তোলা। আপনাদের সঙ্গে আর আমার কোনো কথা নেই। এইবার আমার কথা ভগবানের সঙ্গে। পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী, গুণী মানুষ আছেন, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, তাঁরা সব কাজ ফেলে একটা রহস্যই ভেদ করতে চান, পৃথিবীটা কার? সমাধান কেউই খুঁজে পাননি। মাঝখান থেকে অদৃশ্য একজন বেরিয়ে এসেছেন, যাঁর নাম, ভগবান, গড, আল্লা। তিনিই জীবের অভিভাবক। সে যাই হোক, যাঁকে দেখা যায় না, তিনি থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! তবু তাঁর জন্যে লেখা রইল এই রচনা।

শুনুন ভগবান, আপনার এই রচনা, যাকে ইংরেজরা বলে 'ক্রিয়েশান', বাঙালিরা বলে 'সৃষ্টি', তার রহস্যটা আমি আমার মতো করে ধরে ফেলেছি। এটা আপনার ব্যবসা। আপনি একজন চাষা। পৃথিবী আপনার জমিদারি। সকালে যেমন বাড়ি-বাড়ি পলিপ্যাকে করে দুধ দিয়ে যায়, সেইরকম কুড়ি মাইক্রনের একটা পলিস্যাক, মানে থলেতে, খানিক জল ভরে এতটুকু একটা প্রাণ যার গর্ভে ভরে দেন, তিনি হলেন জননী। ছাগল, গাধা, গরু, ঘোড়া, সকলেরই এইরকম জননী আছে।

ইংরেজিতে বলে র-স্টক। চাষা বলেন বীজ। এই বীজ আপনি আকাশ থেকে পাঠান না। পৃথিবীতে 'অটোমেটিক ম্যানুফ্যাকচার' হচ্ছে। কবে কোন কালে হাজার হাজার হাজার বছর আগে একজন পুরুষ আর একজন নারীকে আপনার এই পৃথিবীতে একা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্যই প্রমাণ মাপের দুজনকে নয়। ওই ভ্রূণের আকারেই দুটি গর্ভের প্রয়োজন হয়েছিল।

সেই দুই নারী আবার কে? কোথা থেকে তাঁরা এলেন! একজন পুরুষেরও তো প্রয়োজন। আপনি যে 'প্রসেসে' জীব সৃষ্টি করেন বিজ্ঞানীরা তা জেনে ফেলেছেন। আপনার কোনো তুলনা নেই ভগবান! আদি রহস্য প্রকৃতই রহস্য। যতই ভাবা যায় ততই মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রথম পুরুষটি কি ভাবে

ঝেড়েঝুড়ে মাটি থেকে উঠল। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে এক থেকে কোটি হলো। জীববিজ্ঞানীরা বললেন—ছিলে বাঁদর হলে মানুষ। বাঁদর যদি মানুষই হলো, তাহলে পৃথিবী জুড়ে এত বাঁদর পড়ে রইল কি ভাবে! যাক গে, আদি-কথা আদিতেই থাক। মানুষ যখন হয়েই গেছি তখন বাঁদরের কথা না ভেবে, মানুষের বাঁদরামির কথাই ভাবি।

মানুষের টানে মানুষ আসে। তাই তো? কে আর শখ করে অনিশ্চয়তায় ভরা এই জায়গায় আসতে চায়! পরিকল্পনাটা অতি অদ্ভুত। এই প্রক্রিয়ায় একটি ছেলে চাই আর একটি মেয়ে চাই। তার অভাব নেই। যেই যৌবন এল, অমনি শুরু হলো কোকিলের কুহুকুহু। এ চাইবে ওকে, ও চাইবে একে। এ আবার অভিভাবকদের সহ্য হবে না। মানুষের মধ্যে, যেমন প্যাকেটের মধ্যে সাদা সাদা সিগারেট থাকে সেইরকম চরিত্র নামের একটা সাদা স্টিক কে বা কারা ভরে দিয়েছেন। দেখা যায় না। অদৃশ্য। সমাজপিতারা সেটিকে নিয়ে শাস্ত্র তৈরি করেছেন। সে আজ নয় বহু দিন আগে। সেই শাস্ত্রের নাম নীতিশাস্ত্র। সেই শাস্ত্র অনুসারে, একটা ছেলে যদি একটা মেয়ের সঙ্গে নির্জনে মেলামেশা করে, তাহলে এ-দেশের ওই শাস্ত্র অনুসারে ছেলেটিকে চরিত্রহীন বলা হবে। এখন দেখতে হবে, অগ্রণীর ভূমিকা কে নিয়েছিল। যদি মেয়েটি নিয়ে থাকে, তাহলে তাকে বলা হবে দুশ্চরিত্রা, একেবারে বাজে মেয়ে। ছেলেধরা। একাল প্রেমের কাল। প্রাচীনরা সব মরে হেজে যাচ্ছে। নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে, ধাক্কা খেতে খেতে, অপমানিত হতে হতে, নিজের সংসারে, অথবা বৃদ্ধাশ্রমে হেঁচকি তুলতে তুলতে হাওয়া হয়ে যাচ্ছেন। এখন নিরালা প্রেমের হিড়িক পড়েছে। অবৈধ প্রেমের বাৎসরিক উৎসবের নাম ভ্যালেনটাইনস ডে।

আগে আড়ালে-আবডালে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হতো। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাত। কেউ আসছে কি-না! কেউ দেখে ফেললে কি-না। সামান্য একটু ছোঁয়াছুঁয়ি। অল্প-স্বল্প অসংলগ্ন কথা। একসময় অল্প বয়সে মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে চালান করে দিয়ে বাবা, মা নিশ্চিন্ত হতো। জেলা শহরের ছেলেরা কলকাতার কলেজে পড়তে আসত। জমিদার পয়সাঅলা ঘরের ছেলেরা, রাখাল যেমন গরু চরায় সেইরকম ইয়ারবকসিদের চরাত। সেতার, সরোদ না সেধে কাম সাধত। মেয়ে শিকারই ছিল তাদের শ্রেষ্ঠ শিকার।

ভগবানের এই পৃথিবীতে দুটি জিনিস নিয়ে সেই পুরাকাল থেকেই মহা অশান্তি। কামিনী আর কাঞ্চন। এই দুটোর জন্যেই আসা, পেলে আনন্দ, না পেলে হতাশা। অবশেষে খেল খতম, পয়সা হজম। আগেও ছিলে না, পরেও

নেই। মাঝখানে একটা রেখা। ভল ভল করে ভলকে ভলকে লোক আসছে, কল কল করে কলের জলের মতো বেরিয়ে যাওয়া। এ এক তামাশা। এরই নাম জীবন।

কোনো কোনো শাস্ত্র বলছেন, এটা নেই। এ হলো মায়া। আমরা কেউ জন্মাইনি। আর যখন জন্মই হলো না, তখন আবার মৃত্যু কিসের? তাও তো বটে! নার্সিং হোমে মিনিটে মিনিটে কারা ট্যাঁ, ট্যাঁ করে উঠছে। আর শ্মশানে, শ্মশানে, 'বলো হরি, হরিবোল' চিৎকারে কি ঢুকছে? শাস্ত্রকে নমস্কার, ভগবানকে নমস্কার। যা হয় বললেই হলো। ভগবানের নামে সবই চালিয়ে দেওয়া যায়। দশটা হাত, বারোটা হাত। চারটে মাথা, পাঁচটা মাথা। নিজের মুণ্ডু ধড় থেকে খুলে রক্ত পান। স্বামীর বুকের ওপর জিভ বের করে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা। মানুষের মুণ্ডু কেটে গলায় মালা। হাতে ঝুলছে বাঁধাকপির মতো স্পেশাল একটা মুণ্ডু। চেনার চেষ্টা করি, লোকটা কি? বাঙালি না অবাঙালি? পাপী অথবা পুণ্যবান? মাঝে মাঝে মনে হয় মায়ের হাতের মুণ্ডুটা আমারই মুণ্ডু। এটা ভাবলে আমার বেশ গর্ব হয়। আর কিছু না হোক মা কালীর হাতের কাটা মুণ্ডু তো হতে পেরেছি। ভগবানের পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন কালীমন্দিরে মায়ের হাতে আমার মুণ্ডুটি ঝুলে থাকবে। ঈশ্বর যদি আমাকে মানুষ না করে ছাগল করতেন তাহলে কোনো এক বাজারে আমাকে কেটেকুটে ঠ্যাঙে বেঁধে ঝুলিয়ে দিত একশ কুড়ি টাকা কেজি। ওই একবারই ঝুলতুম, চিরকাল এই ভাবে মায়ের হাতে দোল খাবার সুযোগ হতো না।

মানুষ কেন জন্মায় এর ওপর আমি একটা থিসিস লিখতে চাই। মানুষ দু'ভাবে আসে। এক প্রেমের পথ ধরে। আর এক ঘৃণার পথ ধরে। দুটি চরিত্র চাই, ক আর খ। ক হলো একটি ছেলে। আর খ হলো একটি মেয়ে। ধরা যাক ক কলেজে পড়ে। আর খ-ও সেই কলেজে পড়ে। খ একদিন সালোয়ার কামিজ পরে ওড়না উড়িয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে হেঁটে গেল। ক তেমন ভাবে দেখল না কিন্তু দেখল। এরপর ক চলে গেল তার বাড়িতে। বইপত্তর খুলে পড়তে বসল। হঠাৎ দেখলে সেই মেয়েটা তার বইয়ের পাতার উপর দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল। ক মনে মনে বললে, এই কি হচ্ছে? সামনে পরীক্ষা, ভীষণ প্রতিযোগিতা, ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। তা না হলে দৌড় থেকে ছিটকে যাব। কেরিয়ারের বারোটা বেজে যাবে। তোমাকে আমি চিনি না, কেন তুমি আমাকে এইভাবে আক্রমণ করছ?

ক জানে না তার ভেতরে অদৃশ্য অনেক বাদ্যযন্ত্র আছে। কোনটা কেন বাজে ক জানে না। জানার চেষ্টাও করে না। এইবার হলো কি ক-র ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। একটা মেয়ের কাছে ইতিহাস দর্শন অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান, পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান কিছুই কিছু নয়। মেয়েটি এইবার তার বইয়ের ডানদিকের পাতার ওপর বসে পড়ল। ক দেখছে টিকলো নাক ছোট্ট কপাল লম্বা লম্বা চুল দুষ্টু দুষ্টু চোখ গোল গোল হাত ভরাট বুক গাঢ় নিতম্ব। ক অসুস্থ হয়ে পড়ল। মনে হতে লাগল একটা ছেলে আর একটা মেয়ে— এরই নাম সংসার! আর অনেক সংসার নিয়ে এই পৃথিবী। কোন রাজা কবে কোন রাজ্য জয় করেছেন, কোন নেতা ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কোন রাজনৈতিক দল কোন দলকে খাবলে-খুবলে দিয়েছে এইসব জেনে কি হবে! একটা মন যদি আর একটা মনের কাছাকাছি এসে পরস্পর পরস্পরকে জয় করতে পারে তাহলে এর চেয়ে বড় বিজয় আর কি আছে! জ্ঞান তো একটাই, এই অচেনা পৃথিবীতে তুমি আমার আর আমি তোমার।

সেদিন হয়তো বসন্তকাল। মাঘের শেষ ফাল্গুনের শুরু। আবার দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে। তিনতলার ঘর। সামনে খোলা জানলা। একটা ফাঁকা মাঠ। বড় বড় কয়েকটা গাছ। মাঠের ওপারে একজোড়া রেললাইন। বাঁদিকে একটা মন্দিরের চূড়া। তার ওপর চাঁদের আলো উপুড় হয়ে আছে। ডানদিকে স্টেশন। সিগনালের আলো। শেষ ট্রেন যাচ্ছে। কারা সব চলেছে কোথা থেকে কোথায়।

ক হঠাৎ কবি হয়ে গেল। পড়ছিল বিজ্ঞান, সে সব ঠেলে সরিয়ে দিল। ক বুঝতেও পারল না এসব ঈশ্বরেরই চক্রান্ত। তিনি নিজেই তো এক বাউণ্ডুলে প্রেমিক! স্রষ্টাকে তো প্রেমিক হতেই হবে। তাঁর সেই ইচ্ছাটাই তো মানুষের ভেতরে বসে আছে। তা না হলে মেয়েদের এত সুন্দর করার কি প্রয়োজন ছিল? ক-কে কাবু করার জন্যেই তো খ-এর সৃষ্টি! যেতে যেতে একবার মাত্র তাকিয়ে ছিল। ক হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ পড়তে শুরু করল। তিনিও তো এক প্রেমিক। অবশ্য প্রেমটাকে দেহের ফ্রেম থেকে বের করে এনে জগতের বিশাল ক্যানভাসে আটকে দিয়েছিলেন নিঃসঙ্গ উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার মতো। ক পড়ছে—

পাগল বসন্তদিন
কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে
বীণা হাতে এসেছিল হেসে
লয়ে তার কত গীত,

কত মন্ত্র মন-ভুলাবার—
জাদু করিবার কত
পুষ্পপত্র-আয়োজন ভার!

রাত যত গড়াচ্ছে আমাদের এই চরিত্র ক্রমশই একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এখন দেখতে হবে খ-এর অবস্থাটা কি? সে হয়তো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। কারণ একটাই—তারা শুধু চলে যায়, নাড়িয়ে দিয়ে যায়। নড়ে ওঠে ছেলেরা। তারা যেন বলতে চায়, 'প্রেমের হাতে ধরা দেব তাই রয়েছি বসে।' এই প্রেমের ব্যাপারটা কাব্য থেকে জ্যামিতিতে চলে যেতে পারে। হয়ে গেল একটা ত্রিভুজ। ওই খ-কে আর একটি ছেলে ভালবাসতে পারে। হয়ে গেল ক খ গ-মার্কা একটা ত্রিভুজ। এবার টানাটানি ফাটাফাটি।

এই ক-এর কলেজেই তার ওপরের ক্লাসে একটি ছেলে পড়ত। লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল। অধ্যাপকদের অতি প্রিয়। একদিন সকালে কলেজের সামনে পার্কে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। পার্কের বেঞ্চির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, ডান হাতটা পাশে ঝুলে পড়েছে। একটা আঙুল ছুঁয়ে আছে ঘাস। সারারাত শিশির পড়েছে তার শরীরের ওপর। প্রশান্ত নিদ্রা। সে তার সহপাঠিনী রেবাকে ভালবাসত। রেবা কোনো অজানা কারণে ওই ক্লাসেরই শঙ্করকে ভালবাসত। শঙ্কর আবার ভালবাসত রেখাকে। রেখা ভালবাসত অতনুকে। অতনু ভালবাসত রমাকে। ইংরেজিতে একে বলে লুজ এন্ড। সবাই প্রেমের মধ্যে রয়েছে কিন্তু গাঁট বাঁধছে না। প্রেমের এই এক মহা সমস্যা। ধোঁয়ার মতো, কিছুতেই বোতলে ভরা যায় না।

প্রেমের আরও এক সমস্যা—অভিভাবক। মেয়ের বাবার ছেলের ঘর পছন্দ হচ্ছে না। আবার ছেলের বাবার মেয়েটির ঘরের চালচলন পছন্দ হচ্ছে না। আলোচনায় এই রকমের কথা শোনা যায়—ওই মেয়ে! ও কোনো দিন ভাল হতে পারে না। ওর মা হলো ছেলেধরা আর বাপটা পরস্ত্রীকাতর। তা না হলে এই বয়েসের একটা লোক চুলে কলপ, মুখে পাউডার! চোখের তলা দুটো দেখেছ! প্যাড তৈরি হয়ে গেছে! তার মানে ভুঁড়িতে কত মাল ঢুকছে বুঝতে পারছ! আর মা-টাকে দেখেছ? ববছাঁট চুল, ঠোঁটে লিপস্টিক—মেয়ের বয়েসের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে। না না, এই ফ্যামিলির মেয়েরা কোনোদিনই সুবিধের হবে না। আমাদের ছেলেটার পালক ছাড়িয়ে তন্দুরি বানিয়ে দেবে। ছেলের মা বলবেন—সুব্রত যদি এই বিয়ে করে তাহলে বউ ওই সদর দিয়ে ঢুকবে, আমি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাব। কত্তা বলবেন—তুমি চলে গেলে আমি থাকব কোথায়? গিন্নি বলবেন, তুমি ছেলের বউয়ের পায়ে তেল দিয়ে

যদ্দিন পার চালাবে তারপরে চলে আসবে আমার কাছে—সেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। কত্তা বলবেন, তুমি যাবে কোথায়? গিন্নি বলবেন, শ্মশানে। কত্তা জিগ্যেস করবেন, জ্যান্ত থাকবে না পেত্নি—না জিগ্যেস করছি এই কারণে তাহলে আমাকে তো ভূত হয়ে যেতে হবে—জ্যান্ত গেলে তো ঘাড় মটকে দেবে। এতদিন দাঁত দিয়ে চিবিয়েছ, ঘাড়ে হাত দেওয়ার সাহস হয়নি। গিন্নি একগাল হেসে বলবেন—না গো, আমাদের কালের প্রেম সে যেন ছাইচাপা আগুন। তোমার অপেক্ষায় আমি শ্যাওড়া গাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকব। তবে একটা কথা জেনে রাখ গলায় দড়ি না দিলে ভূত হওয়া যায় না। আমি একটা শাড়ি রেখে যাব। সেইটাই গলায় দিও। কত্তা প্রেমে উদ্বেল হয়ে বলবেন—মালিনী এত প্রেম তোমার ভেতর! তাহলে এস না দুজনেই একসঙ্গে ঝুলে পড়ি। শাড়ির এদিকে আমার গলা আর ওদিকে তোমার গলা। গিন্নি বলবেন—তাহলেই হয়েছে, মরব আমি, তোমার সত্তর কেজি আর আমার চল্লিশ কেজি। তুমি মাটিতেই থাকবে মাঝখান থেকে আমিই ঝুলে মরব। আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী হলেও তিরিশ কেজি কম। অর্ধাঙ্গিনী আর হতে পারলুম কই! এক-চুতর্থাঙ্গিনী হয়ে রইলুম।

একালে আর একটি পথ খুব খুলছে। সে পথটি হলো দুজনে মিলে সোজা চলে যাও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে। বিয়ে করে বসে পড় পাশাপাশি। বন্ধুবান্ধবরা সাপোর্ট করবে। অভিভাবকরা ওল্ডফুলস! ঈশ্বরের এই সৃষ্টিতে বিয়ের মতো বেপরোয়া ব্যাপার আর দুটি নেই। অনেকটা গলায় দড়ি দেওয়ার মতো ঝুলে পড়—পিছে দেখা যায় গা। এই ব্যাপারটা নিয়ে সাহিত্যে খুব রগড়ারগড়ি আছে। মেয়েটি বড়লোকের ঘরের হতে পারে। ছেলেটি মধ্যবিত্ত। তাহলেই সিনেমার প্লট—বড়লোকের মেয়ে গরিবের ছেলেকে বিয়ে করেছে। এইবার বড়লোকের মেয়েটির অন্য একটি তেঁএটে মার্কা বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল। সে হয়ে গেল ভিলেন। হিন্দি ছবি হলে মেয়েটিকে একদিন গুণ্ডা দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো। অথবা তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা হতো।

আর ছেলেটি যদি বড়লোকের হয় তাহলে সে অবশ্যই ত্যাজ্যপুত্র হবে। আর মেয়েটি তখন তার সঙ্গে বেঁচে থাকার সংগ্রামে নামবে। এমনও হতে পারে ছেলেটি কোথাও চাকরি না পেয়ে কুলিগিরি করছে। আর মেয়েটি হয়েছে বড়লোকের বাড়ির আয়া। সেখানে একদিন বাড়ির কত্তা রেপ করার চেষ্টা করবে। যখন প্রায় ঠেসে ধরেছে তখনই এন্ট্রি নেবে অমিতাভ বচ্চন। ঘুষির

পর ঘুষি। কত্তা শিবনেত্র। সামনে ঝুলছে আধহাত জিভ। মরে গেলে পরের জন্মে নির্ঘাৎ একটি লেড়ি কুকুর।

তাহলে প্রেমের পরিণতি কি? পরীক্ষায় যদি এমন কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে উত্তর হবে এইরকম—হয় বিবাহ না হয় বিরহ। এই জগতে বহু বিরহী লোক আমি দেখেছি। বেশ একটা ভারিক্কি ভাব, মুখে একটা মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রাখেন, অনেকেই বেপরোয়া সমাজসেবা করেন। বছরে একবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। আর সমস্ত মানুষের দিকে অদ্ভুত একটা করুণার দৃষ্টিতে তাকান। যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা বলেন ওঁর জীবনে মস্ত বড় একটা ট্র্যাজেডি আছে। যেন ট্র্যাজিক হিরো এইরকম একজনকে ধরে বসলে এইটিই মানা যাবে—যৌবনে কোনো একটি মেয়েকে ভালবাসতেন কিন্তু বিয়ে হয়নি। অভিমানে আর বিয়েও করেননি। একা একা জীবন কাটাচ্ছেন। আর এইটাই তাঁর অহঙ্কার। ল্যাজকাটা শিয়ালদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ল্যাজঅলা শৃগাল। এইরকম লোক ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হন। এঁদের শেষটা কি হয় জানা যায় না।

আমরা এবার ক-এর কাছে আসি। ধরা যাক ক অনেক কসরৎ করে খ-কে বিয়ে করে ফেলল। পৃথিবীর নিয়মে জীবিকার ক্ষেত্রে দুজনেই নেমে পড়তে পারে। অথবা একজনে আর সেই একজন হলো ক। ক আর খ দুজনেই যদি চাকরি করে তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই ক আর খ-এর মাঝখানে একটি ফাঁক তৈরি হবে। সেই ফাঁকের নাম—সন্দেহ। খ সারাদিন বাড়ি থাকে না। কর্মের জগতে নানা পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা। ক-এর চেয়ে খ দ্রুত ওপরে উঠছে—কেন উঠছে? কি কারণ? এই কারণের ভাবনা সবসময়েই এক রাস্তাতেই ছোটে। সেটি হলো খ মহিলা। তাকে ঘিরে আছে কিছু পুরুষ। তাদের মধ্যে একটি পুরুষের প্রতিপত্তি অনেক বেশি। খ-এর বাড়ি ফিরতে ক্রমশই দেরি হয়। মাঝে মাঝে তাকে পার্টিতে যেতে হয়। সাজপোশাক ক্রমশই আকর্ষণীয় হচ্ছে। ভাল ভাল উপহার নিয়ে আসছে। কারণটা কি? জিগ্যেস করলেই অশান্তি। ক্রমশই কারণ জিগ্যেস করার প্রবণতা কমে আসছে। কারণ একটাই সেটি হলো টাকা। প্রেম এখন লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এইরকম বিজ্ঞাপন চোখে পড়বে—সুন্দরী শিক্ষিতা চাকুরিজীবী পাত্রী চাই। পাত্র সরকারি অফিসার। এখন ঈশ্বরের এই দুনিয়াটিকে চালাচ্ছে একটি গোলাকার বস্তু যার নাম টাকা। টাকায় সব কিছু হজম হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, আসল গল্পটা হলো একটি পুরুষ আর একটি রমণী।

ক আর খ। কয়েক বছরের ব্যবধানে ট্যাঁ করে অবতীর্ণ হবে একটি গ। আজকাল ওই একটিতেই সবাই সন্তুষ্ট। হঠাৎ আর একটিও হতে পারে। তাহলে সংসারটা দাঁড়াল ক খ গ ঘ। এইবার সম্ভাবনাটা এইরকম হতে পারে—একটি ছেলে একটি মেয়ে অথবা দুটিই মেয়ে। আমাদের ঈশ্বর সংখ্যার দিকে নজর রেখে আদিকাল থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কৃষির ফল শাকসবজি ধান গম। আর প্রেমের ফল গোটাকতক মানুষ। কোনো কোনো ধর্মে পঞ্চাশ-ষাটটা ছেলে-মেয়ে হয়ে যেতে পারে। তার কিছু মরে কিছু বাঁচে। যারা বাঁচে তারা বড় হয়ে মানুষ মারে। এদের ধর্মই হলো মানুষ হয়ে মানুষ মারা। মাঝখানে একটা পোস্টার সেটি হলো ধর্মীয় বিদ্বেষ।

সবাই নাকি ঈশ্বর—ভগবানের সৃষ্টি। ভগবানের কাছ থেকে এসে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। সাপের ডিম থেকে সাপ বেরয়। পাখির ডিম থেকে পাখি। মানুষের ডিম থেকে রাক্ষস বেরয় কী করে? মুলোর মতো দাঁত, গোল গোল চোখ, বড় বড় নখ। বাইরে সব দেবতার মতো, ভেতরে দানব। কোথাও যাত্রীবোঝাই ট্রেনে পেট্রল বোমা ছুঁড়ে আগুন ধরাচ্ছে। অ্যাসিড ছুঁড়ছে। জমিতে মাইন পেতে রাখছে। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়ে নিরীহ মানুষদের ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। কচি কচি শিশুদের আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর হ্যা হ্যা করে হাসছে। ঈশ্বরকে তো আর দেখা যাবে না। প্রশ্নও করা যাবে না। তবে উত্তর দিয়েই রেখেছেন। তাঁর অসাধারণ এই সৃষ্টিতে কেউ কংস, কেউ কৃষ্ণ।

না, সবার আগে আমার জানার দরকার, আমি কোন কারণে, কি কারণে এসেছি, কোথা থেকে এসেছি? ধ্যান করো, ধ্যান করলে জানতে পারবে, কেউ আমাকে বলেছিলেন। এক ঋষি এলেন।

কে আপনি?

ব্যাসদেব। তোমার কৌতূহলের উত্তর দিতে এসেছি। ভাল করে শোনো—তোমার ওই দেহই সর্বদুঃখের মূল। তোমার 'তুমি'টা ওই দেহের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে দুঃখ, যন্ত্রণার ফাঁসে জড়িয়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে।

প্রভু! আমি তো ইচ্ছে করে আসিনি ফর্ম ফিল-আপ করে! আমার জন্মের কারণ কি আমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমার কর্মের ফল!

আমার কর্মের ফল? তা হলে আমি আমার আদিতে চলে যাই! আমাকে প্রথম কে এই কলে ঢুকিয়েছিল! সেই প্রথম পিতা কে? কর্মফল তো তার।

আমার কথাটা আমি বলে যাই, তারপর তুমি বসে বসে তর্ক করো

ছোকরা। 'আমি'—এরই নাম অহঙ্কার। যেই 'আমি' বললে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তোমার কর্ম। আমি করেছি, করছি, করব, একে বলে অবিদ্যা। লাল টকটকে গরম লোহা দেখেছো? অহঙ্কার হলো ঠিক সেইরকম। সেই উত্তাপই হলো তোমার প্রাণ।

এই অহঙ্কারের জন্যে মানুষ নিজেকে মনে করে, সে একটা দেহ। আর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ। এসে যায় সংসার। দেহ খোলে আমির অহঙ্কার। সেই 'আমি'র নানা কর্ম ও কর্মফল। ভাল কাজের ভাল ফল, খারাপ কাজের খারাপ ফল। ভাল কর্মের পুণ্যে স্বর্গে গমন। মহাসুখ। পুণ্য যেন টাকা। সঞ্চিত অর্থ। স্বর্গে খরচ হচ্ছে। একদিন সব শেষ। তখন নিজের অনিচ্ছাতেই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতন। এইবার সেই পতনের বিস্তারিত শোনো—প্রথমে পড়বে চন্দ্রমণ্ডলে। সেখানে তুমি যেন একটি শিশিরবিন্দু। এইবার যা ঘটবে তা ঘটবে গভীর রাতে। নিস্তব্ধ চরাচর। নিদ্রিত মানুষ। চারপাশে চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। চাঁদের আলোর রশ্মি ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে শিশিরবিন্দু পৃথিবীতে নেমে আসছে নিঃশব্দে।

পড়ছে কোথায়? ধানের শীষে। ধান থেকে চাল। চাল থেকে অন্ন। সেই অন্ন পুরুষের পরিপাকে বীর্য। এইবার নারীর প্রয়োজন। বীর্যধারী পুরুষের স্ত্রীসঙ্গে রমণীয় রমণ। ঋতুকালে স্ত্রীযোনিতে বীর্য সিঞ্চন। রজ আর বীর্যের মিলনে জরায়ুতে তৈরি হল কলল বা ভ্রূণ।

তুমি এলে। একটি 'আমি', একটি 'তুমি'র মিলনে তৈরি হলো 'সে'। 'ক' আর 'খ', এসে গেল 'গ'। এইবার ঘড়ি চালু হলো জরায়ুতে। টিক টিক ঘড়ি যদি ঠিক ঠিক চলে তাহলে পাঁচরাত পরে তুমি একটি বুদ্বুদের আকার পাবে। অর্থাৎ তোমাকে ধারণ করে তোমার মা হলেন অন্তঃসত্ত্বা। সাত রাত পরে তৈরি হলো ডিমের মতো ছোট্ট একটি মাংসপিণ্ড। মাংসপিণ্ড মানে পেশী। পনের দিনের মধ্যেই সেই পেশীপিণ্ডে রক্ত আসবে। রুধির পূর্ণ হবে। পঁচিশটি রাত্রি পার হলে ওই পিণ্ডে একটি অঙ্কুর বেরবে। যেমন ভিজে ছোলায় কল বেরোয়। এক মাস পরে তৈরি হবে গলা, মাথা, কাঁধ, পিঠ আর পেট। দু'মাসের মধ্যে এসে যাবে হাত, পা, শরীরের দুটো পাশ, কোমর, হাঁটু। এ একেবারে অনিবার্য পরিণতি। এর কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই।

তিন মাসের মধ্যে শরীরের সমস্ত গাঁট তৈরি হয়ে যাবে। চার মাসে হাত আর পায়ের সব কটা আঙুল। পাঁচ মাসে তৈরি হয়ে যাবে নাক, কান, চোখ, দাঁত, নখ ও গুহ্যস্থান। ছ'মাসে পড়া মাত্রই কানের ফুটো স্পষ্ট হবে। এই মাসেই প্রকাশিত হবে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে যোনি ও নাভি। সাত মাসে ফুটবে

গায়ের রোম। মাথায় আসবে চুল। আট মাসে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে স্পষ্ট।

ইতিমধ্যে পাঁচ মাসেই তার চৈতন্য এসে গেছে। এই অবস্থায় সে খাদ্য পাচ্ছে কি ভাবে! নিজের নাভির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সরু সুতোর মতো মায়ের একটি নাড়ি। মায়ের অন্নরসে গর্ভস্থ সন্তান পুষ্ট হয়। এই সময়েই তার পূর্বজন্মের সব কথা স্মরণে আসে। এর পর দশ মাসে এই জঠর যন্ত্রণার সমাপ্তি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পালা।

ঋষি মানুষের জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে গেলেন। জানা রইল। এইটুকু বোঝা গেল, স্বর্গ হইতে চন্দ্রে পতন, তারপর শিশিরের মতো ঝরে পড়া। এক একটি শিশিরবিন্দু এক একটি ধান। আমি ধান্য, তুমিও ধান্য। বাঃ চমৎকার। অন্নময় এই জগৎ, অন্নই প্রাণ, প্রাণই অন্ন। প্রাণবায়ু এই শরীর ত্যাগ করে মহাশূন্যের মহাবায়ুর অনন্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশে যাবে একদিন। নশ্বরদেহ ছাই হয়ে যাবে আগুনে। ঋষির উপদেশ, স্মরণ কর ওঁ-ব্রহ্ম, স্মরণ কর কৃতকর্ম—তোমার কি করার ছিল, আর তুমি কি করেছ। তোমার ওই দেহ এল কোথা থেকে? মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটি উপাদান। তুমি ভূত হলে, অদ্ভুত হলে, তারপর ভূত হয়ে গেলে। শরীরটা আর রইল না। কায়ার বদলে ছায়া।

এ-সব বড় কথা ভাবলেও হয়, না ভাবলেও হয়। সংবাদপত্রে যা থাকে সেইটাই তো আমাদের জীবনকথা। ভারি মজার কথা। প্রথম পাতায় ট্রেন জ্বলছে। গোটা দশেক লোক পেট্রলবোমা মেরেছে, অ্যাসিড ছুঁড়েছে, কুপিয়েছে, খুঁচিয়েছে। অসহায় একদল নারী, পুরুষ, শিশু দলা পাকিয়ে কয়লা হয়ে গেছে। যারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করল, আর যারা নিহত হলো, তারা কে? তারা কারা? ঋষিবর! জবাব চাই, জবাব দাও। জানি কি বলবেন! প্রাজ্ঞ আত্মা, তিনিই সর্বেশ্বর, সকলের প্রভু, স্রষ্টা, নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বজ্ঞ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু আছে কি যা তিনি জানেন না? তিনি অন্তর্যামী। বাইরের জগতে আছেন, আবার দেহজগতের ভেতরেও আছেন। আমাদের পরিচালনা করছেন।

গুজরাতে ট্রেন পুড়ল। আমেদাবাদে বদলা নিল একদল উন্মত্ত মানুষ। ঋষিবর! এইবার বলুন। জানি কি বলবেন—যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তিস্থল এই আত্মা। যাবতীয় বস্তুর লয়স্থানও এই আত্মা। ঘটনায় শিহরিত, আতঙ্কিত হতে হতে বলি, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তা এই অপূর্ব পৃথিবী হাজার বছর আগে যা ছিল, যেমন ছিল, আজও তাই আছে, ভবিষ্যতেও সেই একই রকম থাকবে। সাজগোজ পাল্টাবে।

রাতকে দিন করবে আলোর কেরামতি। এক মাসের পথ ছ' ঘণ্টায় যাওয়া যাবে কনকর্ড বিমানে। দোকানের বাহার যতই খুলুক, পণ্য সেই এক, চাল, ডাল, তেল, নুন, গম, জামা, কাপড়, জুতো। উলঙ্গ মানুষও মানুষ, প্যান্টুল পরা মানুষও মানুষ। স্বভাব সেই এক। সাপ সাপই থাকবে, বাঘ বাঘ। নানারকম ওষুধ বেরলেও অসুখ থাকবে। ওষুধ যত শক্তিশালী হবে, রোগও পাল্লা দিয়ে শক্তিশালী হবে। মানুষ মানুষকে লাঠিপেটা করে মারত, মারবে। একটু আধুনিক করার জন্যে এ. কে ফর্টিসেভেন ব্যবহার করবে। যা ছিল, তাই থাকবে।

ঈশ্বর! আপনার পৃথিবীতে নতুন কি করতে পেরেছেন বা পারবেন! মানুষ পুতুল নিয়ে বিরাট এক বালকের খেলা। মানুষের মডেল তো আর পাল্টাবে না! তবে একটা খেলা জবর খেলা, সেটি হলো স্মৃতি মুছে দিয়ে মানুষকে পাঠানো। শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, মৃত্যু। এই বড় হতে হতে, জানতে জানতে আগুনের দিকে এগনো।

চার বৃদ্ধ যখন এক জায়গায়, তখন এইরকম কথা হতে পারে একটি শিশুকে দেখে, আমরাও একসময় এইরকমই ছিলুম। বলবেন—পবিত্র শিশু। শিশুরাই ভগবান। বক্তব্যকে পরিষ্কার করার জন্যে ইংরিজিতে একজন বলবেন—ইনোসেন্ট চাইল্ডহুড। আর একজন টেক্কা দেওয়ার জন্যে বলবেন—কিংডাম অফ দি গড ইজ ওনলি অ্যাটেনড বাই এ চাইলড্। আর এক বৃদ্ধ ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ছানি পড়া মরা মরা চোখে পথ দিয়ে চলে যাওয়া মেয়ের বয়সী এক সুন্দরী রমণীর দিকে তাকিয়ে অতীত ভাববেন—ফাল্গুন। বসন্ত। সানাই। রজনী আমোদিত রজনীগন্ধার গন্ধে। সালঙ্কারা মেয়েদের চটুল হাসিতে কাঁচ ভাঙার শব্দ! শোলার টোপরে অভ্রের চমক। শাড়ির কত রঙ—লাল, ফিরোজা, মেরুন, পিঙ্ক, ব্লু, জর্দা। নিটোল নিতম্ব, উদ্ধত, বর্তুল বক্ষ, হাঁসের মতো গলা, শালুকের মতো হাত।

যাঃ, আর ক'দিন পরেই মরে যেতে হবে? সুখের দিন বুঝি প্রজাপতি। বিয়ের রাতের মেয়েটি সংসারে এসে স্বপ্নহারা! মনের রঙ বাইরে এলেই বিবর্ণ। আগুনে সব ঝলসে যায়। তবু এই তাঁর চক্রান্ত। বৃদ্ধ হয়ে জীবনকে চেনার আগেই যৌবন জড়াবে সাতপাকে।

আমি টেন, সে এইট। হঠাৎ মনে হয়েছিল, লেখাপড়াটা নীল আকাশের নিচেই জমবে ভাল। এমন কথা তারও মনে হয়েছিল অবশ্যই। এ বাঁশিতে চিরকালই যে ফুঁ দেয় সে বসে থাকে অন্য লোকে, কাব্য-কুসুমের মহা আয়োজনে। সে বসন্তের কোকিল হয়ে ডাকে। নদী হয়ে চাঁদের আলোয় অভ্র

ছড়ায়। সে এলোচুল হয়ে চওড়া পিঠে স্বপ্ন ছড়ায়। সে ডুরে শাড়ি হয়ে তারে দোল খায়। সে মনভোলানো হাসি হয়ে ঠোঁটের কোণে লেগে থাকে।

আবক্ষ পাঁচিলের ওপাশে আমি প্রথমে তার খোঁপা দেখেছিলুম। তখন আমি রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় মজে আছি। ভেতরটা কেমন যেন উটের মতো হয়ে গেল। সাহারায় মরূদ্যান দেখেছে। বিশাল আকাশ হয়ে গেল। ছোট্ট চিল হলো। দীঘি হলো, পদ্ম হলো। ছাত থেকে আর নামতেই ইচ্ছে করে না। যদি আবার আসে। যদি তাকায় একবার। ভাইব্রেশানে ভাইব্রেশানে মিলবেই। সেও ছটফট করছিল। সমস্যা ছিল একটাই। কে আগে কথা বলবে। লজ্জা ব্যবধান।

অবশেষে এক গোধূলি লগ্নে যা থাকে বরাতে আমিই প্রশ্ন করলুম কাঁপা কাঁপা গলায়, 'তোমার পরীক্ষা কবে?'

কি বাজে, বোকা প্রশ্ন। এইসব ব্যাপারে কথার কোনো মূল্য নেই। যা হয় একটা শব্দ হলেই হলো। ইয়া হু, বলে চিৎকার করলেও ধরা যেত কে কি বলতে চাইছে। মেয়েটি পাঁচিলের কাছে সরে এসে মিষ্টি হেসে বলেছিল, 'নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে।'

এত বয়েস হলো আমার, তবু সেই সব দিনের সব কথা আমার মনে আছে। সাতদিন আগের কথা আমার মনে থাকছে না। অ্যালঝাইমারস ডিজিজ। নাম ভুলে যাচ্ছি, ঠিকানা ভুলে যাচ্ছি। বইয়ের নাম ভুলে যাচ্ছি। যত ভুলছি, অতীত তত স্পষ্ট হচ্ছে। বুড়োরা বলছে, বুড়োদের না কি এই রকমই হয়। অতীতে বিচরণ করে।

'তোমার নাম ছন্দা!'

'আমার দিদির নাম ছন্দা, আমার নাম তন্দ্রা।'

'সুন্দর নামটা তোমার।'

'মাসিমা রেখেছেন।'

ফুলের যেমন গন্ধ থাকে। চাঁপা, জুঁই, গোলাপ, করবী। রকমারী গন্ধ। মেয়েদেরও, বিশেষ করে কিশোরীদেরও সেইরকম নিজস্ব গন্ধ থাকে। মানুষও তো প্রাণী। প্রাণ আছে যার। বাঘের গন্ধ, ভাল্লুকের গন্ধ, পাখির নরম নরম গন্ধ, প্রজাপতির পাতা পাতা গন্ধ। তন্দ্রার গন্ধ ভেসে আসছিল। চুলের, ফ্রকের, শরীরের। এতদিন পরেও কোথাও সেইরকম গন্ধ নাকে এলে থমকে যাই। আমার প্রথম প্রেম ফিরে আসে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিকস, ইকনমিকস, এসব হলো বিষয়কে বোঝার বৈষয়িক ব্যবস্থা। অবিষয়কে বুঝতে হলে হৃদয় খুলতে হবে। বেঁচে থাকার একটা বহির্মহল, অন্দরমহল আছে। জুতো খুলে

মন্দিরে ঢোকার মতো, বিষয় ফেলে ঢুকতে হবে। সেখানে অকারণে কান্না, অকারণে হাসি।

মেয়েতে-ছেলেতে ঘনিষ্ঠতা জানাজানি হবেই। উনুনে আগুন, ফোড়ন দিয়ে ডাল সাঁতলানো প্রতিবেশীরা জানবেই। একদিন রাতে একপশলা উপদেশ বৃষ্টি হলো। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। মই দেখেছ, মই। ধাপে ধাপে। স্কুল। লেটার। কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ফার্স্ট ক্লাস। ডক্টরেট। চাকরি। পাকা চাকরি। সম্বন্ধ। বিবাহ। তখন তুমি লাইসেন্স হোল্ডার। একটা ঘর পেলে, একটা বউ পেলে। বিছানা, বালিশ, মশারি। তখন তুমি রাতে দরজা বন্ধ করতে পার। সবাই জানে। তা জানুক। এইটাই নিয়ম। তখন তোমার অপবাদ রটবে না। সবাই জানে, তোমরা একই বিছানায় পাশাপাশি শোবে, কাছাকাছি হবে, ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর। তোমরা প্রেমের কথা বলবে। যে স্টিয়ারিং ধরেছে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, যে একটা মেয়েকে নিভৃতে ধরেছে তার ম্যারেজ লাইসেন্স আছে।

শোনো ছোকরা, তুমি বখে গেছো। ওই ছাতই হবে তোমার কেরিয়ারের সমাধি। একটা মেয়ের জন্যে তোমার জীবনে নেমে আসবে সর্বনাশ। কি আছে বাবা একটা মেয়েতে!

বয়েস যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা রাখছে। চোখ দুটো যখন মণির মতো ঝকঝকে উজ্জ্বল, চুল কুচকুচে কালো, দাঁত ধবধবে সাদা, টুকটুকে লাল লিভার যা খায় তাই হজম করে। হৃদয় নতুন পাম্পের মতো রক্ত তোলে আর নামায়, ফুসফুস দমভোর বাতাস টানতে পারে, সেই বয়েসটায় তোমরা ফিরে যাও তবেই বুঝতে পারবে প্রেমিকা মেয়ে নয়, নদী, নীল আকাশ, বনানী, পাহাড়, ঝরনা, হোমানল, আশ্রয়, নির্ভরতা, সেবা, প্রতীক্ষা। বয়স্কের ঘোলাটে চোখে বোঝা যাবে না। সে চোখে মেয়ে হলো পাপ। পুরুষের সর্বনাশ।

যাবতীয় উপদেশে কাজ হলো না কিছুই। লুকোচুরিটাই বাড়ল। কখন একবার দেখা হবে, কোন ছলে। পাঁচিলের ওপাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে এল, এক মুঠো লজেনস। কখনো ছোট্ট একটা চিঠি। লেখার শেষে ফুটনোট, পড়ে ছিঁড়ে ফেলো।

এই যে এখন আমি যে জায়গাটায় বসে আছি বুড়ো হনুমানের মতো জরাগ্রস্ত শরীর নিয়ে, চারপাশে মুড়ি ছড়িয়ে, এই জায়গায় বসে বসে সেই দূর অতীতে আমি তন্দ্রাকে দেখতুম। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি। বিনুনির বদলে খোঁপা। দেখতে দেখতে সে মেয়ে থেকে মহিলা। কলেজে ঢুকল। আর তখনই

পরিবর্তনটা এল। কিশোরী থেকে যুবতী। মন হলো বিষয়ী। দূরে সরছে। ছাতে কদাচিৎ ওঠে। পথে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অনেক ভেবেচিন্তে সে মনে হয় ঠিকই করেছিল, প্রেমের চেয়ে বিষয় বড়।

তা ঠিক। কি-ই বা আছে আমার। তখনো ছিল না, এখনো নেই। তন্দ্রা বুঝেছিল, ছেলেটা কেরিয়ার তৈরি করতে পারবে না। সে এলেম নেই। ছাতটা আছে, পাঁচিলটা আছে, বাড়িটা আছে, স্মৃতি আছে। আর কিছুই নেই। তন্দ্রার দুই ভাই বসবাস করছে। বড় ভাইয়ের মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। রাস্তার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটে। সোজা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে উলটো দিকে হাঁটা শুরু করে। ভদ্রলোক, বড় অমায়িক ছিলেন। আমরা প্রায় সমবয়সী। কখনো পথেঘাটে দেখা হলে, কাছাকাছি সরে এসে কানে কানে বলে, মনে আছে তো। ভোলোনি।

বুঝতে পারি না, কি বলতে চাইছে! এই রকম নাকি, তন্দ্রাকে ভোলোনি? মনের ব্যাপার মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। মন বেলাভূমি নয়, প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচ।

একজন আছে, যে আমার দেখাশোনা করে। সে আমার কল্পনা। যখন যা সাজাই তাই সাজে। কখনো মা, কখনো দিদি, কখনো স্ত্রী, কখনো বন্ধু। পরামর্শ করি, হুকুম করি, আবদার করি। হেরে যাব নাকি? মানুষের কাছে হাত পাতবো, করুণা চাইবো। কখনোই না।

এই যে সন্ধে হয়ে আসছে, একটু শীত শীত। আমার স্ত্রী এসে গায়ে একটা চাদর ফেলে দেবে। কাঁচাপাকা চুল। চোখে চশমা। প্রসন্ন হাসি। বয়েস হলেও বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েনি। চাদরটা গুছিয়ে দিতে দিতে স্বগতোক্তির মতো বলবে, আর মিনিট পনের, তারপর ঘরে যাবে। কার্তিকের হিম গায়ে লাগাবে না। বয়েস হচ্ছে। ভুলে যেয়ো না!

আমি জানি এই বুড়োর জন্যে এই সাবধান বাণী বাতাসে ভাসছে, আমাকে ধরে নিতে হবে রেডিও হয়ে। এমনি কত বাণী আমার জন্যে আছে এই ঈথার তরঙ্গে। ছেলেবেলায় ওই ওপাশের মাঠে যেখানে এখন নব্য বড়লোকদের ফ্ল্যাট উঠেছে সারসার, সেখানে যখন ড্যাংগুলি খেলতুম, তখন বাবা এসে শাসন করতেন, লেখাপড়া করে বড় হও তারপর গুলি খেলার অনেক সময় পাবে। এই ছাতে যখন ফ্যাঁচাত ফ্যাঁচাত করে সিকিতে ঘুড়ি হ্যাঁচকাতুম তখনও সেই এক শাসন, আগে কোনো রকমে বড় হও, তারপর যত খুশি ঘুড়ি উড়িয়ো, কেউ কিছু বলবে না। আমার বউ বলত, যতদিন আমি আছি ততদিন আমার কথা শুনে চলতে হবে, যখন আমি থাকব না তখন যা খুশি তাই

কোরো। তা কি করা যায়? প্রেমের শাসন, প্রেমের শৃঙ্খল সোনার চেন হয়ে গলায় ঝোলে। কিছু করতে গেলেই মনে পড়ে যায়। যখন বেঁচে ছিল অবাধ্যতা করেছি। দুঃখ দিয়েছি। এখন নেই। সে তো বাইরে নেই, বসে আছে ভেতরে। গাড়ির আরোহী এখন স্বয়ং চালক। ঈশ্বরকে একটা কারণে ধন্যবাদ, মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলুম বলেই না মায়াকে জানতে পারলুম, মোহিনী মায়া। আমি আমার শাসনকর্তাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে এখন বলতে পারি, অভিভাবকগণ! আপনাদের কোনোরকম অসম্মান না করে নিবেদন করছি—

এখন আমার বয়েস হয়েছে, বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আমি না ড্যাংগুলি খেলবো, না ঘুড়ি ওড়াবো, না যা খুশি তাই করব। তেঁতুলের আচার খাবো। গরম আলুর চপ। না সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে সপ্তমী পুজোর দিন তন্দ্রাকে নিষিদ্ধ চুম্বন। ভিজে ভিজে ঠোঁট, হিলহিলে জিভ। তন্দ্রা দু'হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরেছিল। বুকে বুক লেগে গিয়েছিল। বিপুল আনন্দে আমাদের শরীর কাঁপছিল। কঠিন শাসনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুই কারাবাসী। পুজোর হুল্লোড়ে সবাই মেতে আছে। ঢাক বাজছে বারোয়ারিতলার প্যান্ডেলে। ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, আবার ভয়ও করছে। কার্তিকের প্রথম। ছাদের মাথায় আকাশপ্রদীপ। সপ্তমীর ফালি চাঁদ। অবাক শিশুর চোখের মতো একটা তারা। হাতির মতো শরতের একখণ্ড মেঘ। হঠাৎ কার কাশির শব্দ। দু'জনের বন্ধন ছিটকে গেল। তন্দ্রা পালাল পাঁচিল টপকে। ভালো ছেলের মতো মুখ করে নেমে এলুম নিচে। তখন সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুদের বলতে ইচ্ছে করেছিল। গল্প নয়, সত্য এক প্রেমের কাহিনী। সে যুগে একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের ভাব-ভালবাসা হওয়া এখনকার মতো অত সহজ ছিল না।

নির্জন ছাত স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছে। ছাতটার বয়েসও তো কম হলো না। রোদে পুড়ে জলে ভিজে কালো হয়ে গেছে। স্মৃতির গুঁড়ো জমে আছে কোণে কোণে। কতকাল আগে বিশাল এক প্যান্ডেল খাটানো হয়েছিল এই ছাতে। বুড়োর তখন পাটভাঙা যৌবন। চাকরিবাকরি করছে। বিয়ে হচ্ছে। ছোটকত্তা বৃদ্ধ হয়েছেন, মেজকত্তা বিদায় জানিয়েছেন পৃথিবীকে। তাঁর শ্রাদ্ধেও অনুরূপ একটা প্যান্ডেল হয়েছিল। তফাৎ এই, সেটায় শোক, এইটায় আনন্দ। লোকজনে বাড়ি ভরে গেছে। প্যান্ডেলের একপাশে হালুইকরের কেরামতি চলেছে। পোলাও তৈরি হচ্ছে। বিশাল পেতলের হাঁড়ির মুখে একটা ঢাকনা তার ওপর চাপাচ্ছে জ্বলন্ত কাঠকয়লা। একটা চালের গায়ে আর একটা চাল লাগবে না, এমন তরিবাদির জিনিস নামাতে হলে এই কায়দা। জায়ফল আর

জাফরানের সুগন্ধ। বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে দিয়ে ছোটকর্তা সুপারভাইস করছেন। সার সার জলের ড্রামে কেওড়া দেওয়া জল। শীতকাল, নভেম্বরের শেষ। কমলালেবুর চাটনি হবে। দু'জন কমলালেবু ছাড়াচ্ছে। গন্ধে ইডেনে ক্রিকেটের কথা মনে পড়ছে। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিজয় হাজারে, মার্চেন্ট, মানকড়। কাঠের বারকোশে দরবেশ পাকানো হচ্ছে পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ দিয়ে। বাচ্চারা ছোঁক ছোঁক করছে যদি একটু পাওয়া যায়। কিন্তু কড়া পাহারা।

এই ছাতে সেদিন কি ব্যস্ততা। ইলেকট্রিকের লোক লাইন টানছে। ডেকরেটারের লোক ঝালর ঝোলাচ্ছে। বাঁশে ভেলভেট মুড়ছে। ফুলের লোক মালা দোলাচ্ছে। যে জল তুলছিল সে শিস দিচ্ছিল হিন্দি গানের সুরে, জিয়া বেকারার হায় সোই বাহার হায়। ছোটকত্তা এক ধমক লাগালেন। ছেলেটা একটু ফচকে মতো ছিল। সে হাসতে হাসতে বলেছিল, ছোটবাবু এটা বিয়েবাড়ি, ছেরাদ্দবাড়ি নয় গো। ছোটকত্তা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

সকাল থেকেই উদ্বেগ চলছিল, দই আসছে না, দই আসছে না। হঠাৎ চিৎকার উঠল, এসেছে এসেছে। স্পেশ্যাল দই। একটু দূর থেকে আসছে। ছোটকত্তা বিশেষত্বটা তাঁর বন্ধুকে বোঝাচ্ছেন। ভাঁড় উপুড় করলেও দই পড়বে না। প্রত্যেকটা হাঁড়ির গায়ে খড়ি দিয়ে ওজন লেখা।

এই বুড়ো সেদিন কি করছে! বোকা বোকা, লাজুক লাজুক মুখে ঘুরছে। মাঝে মাঝে বউয়ের ঘরের সামনে দিয়ে অকারণে যাওয়া-আসা করছে। মেয়েরা ঘিরে বসে আছে। রকম রকম মেয়ে। উচ্ছলিত হাসির শব্দ। চুড়ির রিনিঝিনি। একবার এক ফাঁকে একটু চোখাচোখি হয়েছিল। সে যেন পাতা সরিয়ে ফুল দেখার মতো।

অনেক রাতে নিমন্ত্রিতরা যখন সবাই চলে গেলেন, তখন পরিবারের সবাই বসল আহারে। নতুন বউ একপাশে। তাকে সবাই আদর করে খাওয়াচ্ছে। মাথায় এক চিলতে ঘোমটা। ছোট্ট কপালে টিকলি। ফর্সা মুখে লাল চন্দনের ফুটকি সাজ। লাল বেনারসি, জড়ির পাড়। গোল হাতে সোনার চুড়ি। সবাই সাধছে, খাও, একটু খাও।

এই বুড়ো দূরে বসে ভাবছে, ওই আমার বউ। আমার পাহুপাদপ। যেন জীবনের সব পাওনা মিটে গেল। আর বাকি রইল না কিছু। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শ্রমনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সব অবান্তর। বিশাল, জটিল পৃথিবী ছোট হয়ে ঢুকে গেল চার দেয়ালে। সেগুনের খাট, কাপাসের তোশক, সুতীর চাদর, সাদা মশারি, মৃদু আলো, একজন নারী, অনর্গল কথা,

অপরিমিত ভালোবাসা। একটা গাছ একটু ছায়া। আকাশ ধরেছে জলাশয়। আ, তাই এত দুঃখ—

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় হায়'।।
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়।।

এই সব ঠুনকো জিনিসের বাজারি বিশ্বে কোনো দাম নেই। এ আমাদের বিলাসিতা। আমেরিকার বুড়ো এসব ভাবে না, ভাববে না। এই বাঙালি বুড়ো বসে বসে এইসব ভাববে। বুকটা কেমন করবে। চোখ ছল ছল। দুঃখে কত সুখ! তাই না! অতীতের ফ্রেমে ভাবনার ছবি। সেই রাত।

ছোটকত্তা সাধারণত ইমোশনাল হন না, সেই রাতে হঠাৎ একটা হাতলঅলা চেয়ার দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। মেজকত্তা সেই চেয়ারটায় বসতেন। কেবলই বলতে লাগলেন, আজ যদি মেজদা বেঁচে থাকত। আর সেই মুহূর্তে নতুন বউ ঘোমটা টোমটা খুলে এগিয়ে এল শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। লজ্জা, সঙ্কোচ কিচ্ছু নেই। হাত ধরে নিয়ে চলল ঘরের দিকে। একেই হয়তো বলে, হাল ধরা। আধঘণ্টা পরে ঘরে শোনা গেল হাসি। দু'জনের হাসি। ছোটকত্তা বারে বারে বলছেন, ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। প্রবীণরা একটু অসন্তুষ্ট হলেন ঠিকই। বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি, তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

সেই রাতের সেই ছাতটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। এমন হাহাকারের মতো ফাঁকা ছিল না। চারপাশ ঘেরা। তবে রাত একটার সময় মনে হচ্ছিল, জীবনে যা একবারই হয় সেই মধুর ঘটনাটা শেষ হয়ে গেল। ফটফটে আলোয় তেড়াবেঁকা পড়ে আছে টেবিল-চেয়ার। ছেঁড়া কাগজ। ঝুড়িতে ভাঙা, টুকরো লুচি। একটা ট্রেতে বিধ্বস্ত কয়েকটা চপ। একটা নিটোল কমলাভোগ পড়ে আছে এক কোণে। কার খোঁপা থেকে খুলে পড়ে গেছে গোড়ের মালা।

হঠাৎ পাঁচিলের ওপাশে একটা মূর্তি দেখা গেল। প্রায় অন্ধকারে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সেই পাগল বড় ভাই। বলে উঠল, 'এই যে মনে আছে তো। ভোলোনি।'

ভুলবো কেন, আমার সেই টেবিল ঘড়ি আজও চলছে। শুধু তার অসুখটা গেল না।

আরো কিছুক্ষণ বসা যেত, পাগলের ভয়ে পালিয়ে এলুম। ওই সামান্য কথাটাই আমাকে অসুস্থ করে তোলে, ও কি আমার সেই প্রথম প্রেম, নারীর বিশ্বাসঘাতকতার কথাটাই মনে করিয়ে দিতে চায়! লোকটা হ্যামলেট না কী,

বলতে চাইছে, Frailty, thy name is woman! না আরো গভীর কথা। ভোলোনি তো ভাই। যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে।

ঈশ্বর সেই রাতটা দাও না ফিরিয়ে
আর একটিবার
যারা ছিল বড় আপনার
সানাই ছাড়ুক একটু সুর
রজনীর গন্ধ মধুর।।

একটা বড় স্টিলের আলমারির সামনে দাঁড়ালুম। খুলতে ভয় করে। মহাকাব্য। দুঃখসুখ সবই ভরা আছে। খোলামাত্রই বেরিয়ে পড়বে। আমার জামাকাপড়, তার জামাকাপড়। সেই সেটটাও আছে। ফুলশয্যার রাত লেগে আছে। রজনীগন্ধার গন্ধ। কে তার মাথায় ছড়িয়ে দিয়েছিল অভ্র। তার কুঁচি খুঁজে পাওয়া যাবে অনুসন্ধানে। সাটিনের অন্তর্বাসে এখনো ধরা আছে যৌবনের উত্তাপ। চারটে অ্যালবামে বিভিন্ন সময়ের ছবি। এক প্যাকেট চিঠি আছে রোদ বৃষ্টির মতো। আরো সব স্মৃতি আছে। সময় চলে গেছে পাশ কাটিয়ে। পাগলামি আমার, পাল্লার ভেতর দিকে দু'লাইন সংস্কৃত শ্লোক কাগজে লিখে সেঁটে রেখেছি,

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎকৃষ্ণ। কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদযদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।।

বিল্বমঙ্গলে পেয়েছিলুম। বৃন্দাবন। অন্ধ বিল্বমঙ্গল বসে আছেন ব্রহ্মকুণ্ডে। চড়চড়ে রোদ। অভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এলেন গোপবালকের ছদ্মবেশে। বড় দয়া হয়েছে। বলছেন, সাধু। রোদে কেন? ছায়ায় এসো, মা খাবার পাঠিয়েছে, তুমি খাবে তো। সাধু বুঝতে পেরেছেন, কে এই বালক, এমন যার গলা, গায়ে যার এত সুগন্ধ।

বিল্বমঙ্গল বলছেন, অন্ধ আমি, চোখে দেখি না, তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে চলো।

বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ দূর থেকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছেন, ধরো সাধু।

আমি দেখছি না, বড় কিছু দাও। তোমার হাতটা বাড়াও।

যেই হাতটা এগিয়ে দিয়েছেন খপ করে চেপে ধরেছেন বিল্বমঙ্গল, আর তো ছাড়ব না, তোমাকে যে আমি চিনে ফেলেছি প্রভু।

শ্রীকৃষ্ণ তখন ছল করে বলছেন, আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, আমার যে লাগছে।

বিল্বমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দূরে সরে গিয়ে হাসছেন।

বিল্বমঙ্গল সেই সময় ওই শ্লোকটি বলছেন, গিরিশচন্দ্র বাংলা করেছেন,

ছলে হাত ছিনাইলে
পৌরুষ কি তাহে তব?
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে
তবে তো তোমারে গণি।

এই কথাটা আমি তাকে বলছি, যে স্মৃতি হয়ে বসবাস করছে লোহার আলমারিতে। হৃদয় থেকে পালাতে পেরেছ?

নীল চাদরটা বের করলুম, শীত শীত করছে। আলোয় ধরেছে বাদুলে পোকা। মৃদু হলেও আসবে শীত।

আর একটু পরেই অপরেশ আসবে। থিয়েটারে ঐতিহাসিক পালায় এক সময়ে খুব নাম করেছিল। তার বিখ্যাত অভিনয় সাজাহান। রাতের পর রাত মঞ্চ কাঁপিয়েছে, দর্শকদের কাঁদিয়েছে। সেই সময় পেশাদারী মঞ্চে মাঝে মাঝে কম্বিনেশান নাইট হতো। বিখ্যাত অভিনেতা, অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কে কাকে টেক্কা মেরে যেতে পারে। অপরেশের পাশে সবাই ম্লান। থিয়েটার আর নেই। সব পুড়ে গেছে। সন্ধে হলেই পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াবার জন্যে অপরেশ ছটফট করে। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, ভাস্করপণ্ডিত, কার্ভালো, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, একের পর এক চরিত্র ঘাড়ে চাপে।

স্টেজ নেই, বোতল আছে স্মৃতি আছে। আমি বেশ বুঝতে পারি, রাতটা ওর কাছে এক বিভীষিকা। থিয়েটারেরই এক সুন্দরী রত্নাবলীর সঙ্গে থাকত। তিনি হঠাৎ আত্মহত্যা করলেন। যৌবন ফুরিয়ে যাচ্ছে দেখে পালালেন। এই রকমই ব্যাখ্যা। সাধারণের ভাবনা সরল পথে চলে। তিনি সুইসাইড নোটে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা লিখে রেখে গিয়েছিলেন। অপরেশ সেটিকে বাঁধিয়ে রেখেছে—

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে
দিইনি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন
নিশীথে বিলীন—

দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

শ্মশানে গিয়েছিলুম। সন্ধ্যার আকাশে চিতার লকলকে আগুনকে মনে হয়েছিল রক্তিম মরীচিকা। চোখের সামনে আগুনে ছাই হচ্ছে সুন্দর একটি দেহ, একটি প্রতিভা। যা এতদিন দগ্ধ হচ্ছিল লালসার আগুনে। অপরেশ যদি নাও আসে প্রতাপ আসবে।

প্রতাপ, আমার বাল্যবন্ধু, আজকাল প্রায়ই একটু রাতের দিকে আসে। গ্রেট প্রতাপ। আসার কারণ আছে। স্বার্থ ছাড়া একালে কে কার কাছে আসে। হৃষ্টপুষ্ট সামান্য কারণাসক্ত প্রতাপ আসে আমার মগজ ধোলাই করতে। এসেই বলবে, 'ইউ আর কিলিং ইওরসেলফ্। এই বয়েসে বিদেশে একটা মানুষ নতুন করে জীবন শুরু করে...আর তুমি কি করছ। ব্রুডিং অ্যান্ড ব্রুডিং। ভূতের মতো এঘরে ওঘরে, ছাতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ছাতে পায়রা থাকে, মানুষ তোমার মতো সারাদিন থাকে না।'

'আমি নিজের মতো করে একটা জীবন বেছে নিয়েছি, এতে কার কি অসুবিধে হচ্ছে ভাই!'

'এই মুহূর্তে তোমার জীবনে একজন নারীর প্রয়োজন। এই বয়েসটা খুব সাংঘাতিক।'

'আমার কামনা-বাসনা সব মরে গেছে।'

'প্রতাপ হই হই করে হাসবে। বিশ্বাস করবে না। ওর ধারণা, যায়, তবে চিতায় উঠলে, তার আগে নয়। নেভার। অবদমিত কাম অনেকরকম চেহারা নিতে পারে। পাগলও হয়ে যেতে পারে। যেমন হয়েছে তন্দ্রার বড় ভাই। বয়েসকালে বিয়ে করলে আজ এই অবস্থা হতো না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রতাপ বলবে, 'আমাকে দেখো। এই বয়সে মেন্টালি, ফিজিক্যালি কত ফিট। নো সুগার, নো প্রেসার, নর্ম্যাল হার্ট। সিক্রেটটা কি? আমি সবসময় বাঁচতে চাই। মৃত্যুর কথা একবারেই ভাবি না। তুমি যে ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছ, তার প্রমাণ তোমার এই ঘড়ি। ঘড়িটাকে কোলে করে বসে আছ সারাদিন। কি পাও ঘড়িটার কাছ থেকে?'

'শুনবে কি পাই। অনন্তকালের পায়ের শব্দ। শিশুকাল, কৈশোর, যৌবনকাল থেকে প্রৌঢ়কাল অনাগত কাল। মহাকালের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছি ভাই। বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে উঠেছেন ব্রহ্মা। বিষ্ণু হলেন ত্রিকাল, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। সময়ের নাড়ির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছি।'

'রাবিশ! আমার সঙ্গে চলো। এক পেগ খাও, একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, একটু ফুর্তি করো, দেখবে বাস্তবে ফিরে এসেছো।'

প্রতাপের ধান্দা খুব ভাল। রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করে। রোজই এসে আমাকে একটা টোপ খাওয়াবার চেষ্টা করে। বাড়িটা আমাকে বেচে দাও। এখানে একটা ফ্ল্যাট তুলি। দাম তো পাবেই, প্লাস একটা ওয়েল ফারনিশড ফ্ল্যাট। টাকাটা ফিকসড্ করে দাও, তোফা মাঞ্জায় জীবন কাটাও। সন্ধের দিকে টিভি দেখতে দেখতে দু'পেগ বিলিতি খাও, একজন বান্ধবী যোগাড় করে নাও। ল্যাং খেয়ে উল্টে পড়েছ, ঝেড়েঝুড়ে উঠে দেখিয়ে দাও, আগের চেয়েও ভাল আছ।'

'প্রতাপ দি গ্রেট, আমি কি খুব দুঃখে আছি?'

'ইউ হ্যাভ নো ফিউচার।'

'তা হলে শোনো প্রতাপ, সংস্কৃতকে বাংলা করে বলি।—

'কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুন সখা কৃষ্ণকে বলছেন, হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, সুখভোগ আর জীবনধারণেরই বা কি প্রয়োজন, সবই যদি গেল, সবাইই যদি গেল, একা রাজ্যসুখ ভোগ করে লাভ কি!'

'আবার একটা রাবিশ। ভোগ করার জন্যে এসেছি, চুটিয়ে ভোগ করে যাবো। তোমার মস্তিষ্কে অনেক আবর্জনা ঢুকেছে। ও আর সহজে বেরোবে না। তুমি তাহলে একটা কাজ করো। বাড়িটা আমাকে দাও। নেট বিশ লাখ। এখানে একটা ভাল ওলড এজ হোম হয়েছে। গঙ্গার ধারে। টাটকা নতুন। এককালীন জমা পঞ্চাশ হাজার, মাসে মাসে এগারশো, অল ফাউন্ড। জায়গা এখনো আছে। সেইখানে থাকো। বি ক্লেভার। ডোন্ট বি এ ফুল। টাকার ভ্যালু বুঝতে শেখো। এই বাড়ি কি তোমাকে কোনো ইনকাম দিচ্ছে! বরং এটাকে রাখতে গিয়ে তোমার খরচ হচ্ছে। মেনটেন করতে না পারলে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে। চামচিকের আড়ত।'

এমন একটা ভাব দেখালুম যেন বিশ লাখের টোপটা গিলেছি। প্রতাপের ফোলাফোলা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রতাপের এক পাঞ্জাবী পার্টনার আছেন, তিনি এই অঞ্চলটাকে একটা লিট্‌ল পাঞ্জাব করে তুলতে চাইছেন। শালা বাঙালির জন্যে কোথায় কোন জেরুজালেম তৈরি হচ্ছে কে জানে। এই সব পয়সাঅলা অবাঙালিদের চোখে বাঙালি এখন চাকরবাকরের জাত। আর পয়সাঅলা বাঙালি যে কজন আছে, তারা আবার নিজেদের বাঙালি বলতে লজ্জা পায়। তারা হলো রিঠাফল, সোপলেস সোপ, জাতহীন জাত। প্রতাপ যখন ভেবেই নিয়েছে, এইবার আমি ভাঙছি, তখনই আমি বললুম, 'ছাত,

ছাতের তলায় বিশাল এক যৌথ পরিবার বাসা বেঁধেছিল, সে আজ নয়, অনেক বছর আগে। তখন রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলত। মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেত ঘোড়ার গাড়িতে। এই ছাতের তলায় জমা আছে তিনপুরুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের স্মৃতি। ওরা কেঁদেছে, হেসেছে, মান-অভিমান করেছে। স্থূলে না থাক সবাই সূক্ষ্মে আছে। শেষ প্রতিনিধি এইখানেই মরবে। তোমার ওই বৃদ্ধনিবাসে নয়। জায়গাটা আমি দেখে এসেছি। গঙ্গার ধারে। অতি সুন্দর। নতুন বাড়ি। পশ্চিমের জানালায় গেরুয়া গঙ্গা। জানালা খুললে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। ধাপধাপ বাগান চলে গেছে গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত। মাঝারি মাপের ঘরে এক জোড়া বিছানা, চমৎকার আধুনিক টয়লেট ঝকঝক করছে। এক এক ঘরে দু'জনের স্থান। নতুন একটা মন্দির আছে, লাইব্রেরি আছে, আছে চিকিৎসা কেন্দ্র। দেখে এসেছি সব। অনেকেই এসে বসবাস করছেন। পয়সাঅলা পরিবারের প্রতিনিধিরা। কেউ ছিলেন সম্মানিতা শিক্ষিকা, কেউ খ্যাতিমান সাংবাদিক। কিন্তু ভাই, সবাই এক একটা ঘড়ি। টিকটিক করে এগিয়ে চলেছেন সূর্যাস্তের দিকে। সার সার বসে আছেন সবাই পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে। দিন ছোট, রাত বড়, জীবনের শীতকাল। প্রতাপ বলতে পার, পাঁচতারা হোটেল কেন বাড়ি হয় না? আর মন্দির কাকে বলে?'

গম্ভীর মুখে প্রতাপ বললে, 'জানি না।'

প্রতাপের আগ্রহ কমে গেছে। প্রতাপ এইসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। জীবনের দুটো জিনিস সে বোঝে, ভোগ আর অর্থ। মনে হচ্ছে, পালাতে পারলে বাঁচে।

'ছাতের তলায় সংসার না পাতলে গৃহ হয় না। জন্ম হবে, বিবাহ হবে, মৃত্যু হবে। শাঁখ বাজবে, উলু দেবে, শোকের কান্না উঠবে। মঙ্গল কাজে দেয়ালে পুতুল আঁকবেন পুরোহিত। উনুনে আগুন পড়বে, রান্নার গন্ধ ছড়াবে বাড়িতে। জ্বর হলে ডাক্তার আসবেন। আরোগ্যে সত্যনারায়ণ। সন্ধ্যার প্রদীপ পড়বে ঠাকুরঘরে। ছাতের তারে শাড়ি দুলবে বাতাসে। তবে, তবেই হবে গৃহ। নয় তো হোটেল, পান্তশালা। আর চূড়ার তলায় লাখ টাকা দামের মূর্তি রাখলেই মন্দির হয় না। জমাতে হয় সময়। সময়ই দেবতা। যুগযুগ ধরে বিশ্বাস হাতে নিয়ে ভক্তের দল আসবে। ভিখারি আসবে, কুকুর আসবে, পাগল আসবে, গরু আসবে, মাতাল আসবে, লম্পট আসবে, সতী আসবে, অসতী আসবে, তবেই হবে মন্দির।'

প্রতাপ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। চেয়ার ঠেলার শব্দ শুনেই মনে হলো

রেগে গেছে। অসহ্য লাগছে আমাকে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, 'রাবিশ। ওয়েস্ট অফ টাইম।' চলে গেল জোরে জোরে পা ফেলে। লোকটা কি বোকা। বিশ লাখ টাকা বেঁচে গেল, থ্যাংকস বললে না একবারও।

এই এত বড় বাড়িতে রাতের বেলাটাতেই একটু ভয় ভয় করে। নানা রকম শব্দটব্দ হয়। সেই সব শব্দের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করেও পাইনি। নিচেটা অন্ধকার। দোতলায় আমি একা। ভূত আমি বিশ্বাস করি। দু'একবার দর্শনও পেয়েছি। এই বাড়িতে নয়। বাইরে বেড়াতে গিয়ে। কেউ বিশ্বাস করে না, আবার ভয়ও পায়।

এই পাড়ায় আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে। কোনো কারণ নেই, অকারণেই আমার ভালো চায়, আমি ভালো আছি দেখতে চায়। পৃথিবীতে ঝড়তি পড়তি এখনো কিছু বোকা লোক আছে। তার বড় মেয়ে বি.এ পড়ছে। মাঝে মাঝে এসে ইংরিজিটা পড়ে যায়। আসার কোনো সময় নেই। বুড়োর কাছে যে কোনো সময়েই আসা যায়।

সে আছে। বেশ মিশুকে মেয়ে। একাল সেকাল মিলিয়ে একটা মিক্সশ্চার তৈরি হয়েছে। বেশ কর্মঠ। যখনই আসে আমার অনেক কাজ করে দেয়। এলোমেলো ঘর গুছিয়ে দেয়। বইপত্তরের ধুলো ঝেড়ে দেয়। কখনো স্টোভ জ্বেলে কিছু একটা তৈরি করে দেয়। চা করে খাওয়ায়। মজার মজার কথা বলে। গুনগুন করে গান গায়। প্রথম প্রথম আপনি বলত, এখন তুমি বলে। আধুনিকারা আপনি বলাটা অপছন্দ করে। তুমি শুনতে আমরও ভাল লাগে। মানুষ মানুষকে টানে। কাছে আসতে চায়। মানুষের স্বভাব। মেয়েটির নাম, অচলা। আমি এখন তাকে তুই বলি।

বুড়োটাকে নিয়ে সে খেলা করে। এক অর্থে শিক্ষক হলেও আমি তার বন্ধুর মতো। ওই যে বলেছি পৃথিবীতে বন্ধুত্বের মতো সম্পর্ক নেই। ঘাসের মতো স্নেহ নেই, সমস্ত অবহেলা ঘাস ঢেকে দেয়। পরিত্যক্ত, বিস্তৃত সমাধি ঘাসে ভরে যায়। বৃষ্টির মতো সমাজবাদী কেউ নেই। মেঘের মতো উদারতা কারো নেই, আগুনের মতো সংস্কারমুক্ত।

অচলা আমার চুলে চিরুনি বোলাতে বোলাতে বলেছিল, 'এখনো ভালোই আছে। ভাবছি কলপ দিয়ে তোমাকে আর একবার পিঁড়েতে বসাবো।'

'পাত্রী কোথায় পাবি?'

'রং মাখা বুড়ি অনেক আছে, প্রায়ই চোখে পড়ে। তোমার চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, গৃহকর্মে সুনিপুণ। তোমার পাত্রীর অভাব হবে না। বুকের ছাতিটা

এমন কপাটের মতো করলে কি করে? কলেজ জীবনে প্রেম করার জন্যে বারবেল ভাঁজতে বুঝি?'

'আরে না, দুঃখ সইতে হবে বলে ভগবান বুকটা চওড়া করে দিয়েছেন।'

একদিন এল উল নিয়ে, 'দেখো এই বুড়োটে রংটা তোমার পছন্দ কি না?' 'আমার পছন্দে কি হবে?'

'সোয়টারটা তো তোমারই হবে না অন্য কারো!'

'আমার সোয়টার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জীবনে তো কেউ করে দিলে না, আমি একটা করে দি।'

'তুই এতগুলো টাকা আমার জন্যে খরচ করলি!'

'পড়িয়ে শোধ কোরো। এখন বসে বসে গোলা পাকাও, আমি চা করি। বিকেলে চা-টা কিছু জুটেছে?'

'ভুলে গেছি।'

'ভুলে গেছি মানে? খেয়ে ভুলে গেছ, না ভুলে খাওনি? প্রথমটা হলে ভীমরতি। দ্বিতীয়টা হলে দার্শনিক। কোনটা?'

'দ্বিতীয়টা।'

'ওষুধ এনে দিয়েছিলুম, খাচ্ছ, না ভুলে বসে আছ!'

'মনে পড়লে খাই, ভুলে গেলে খাই না।'

'সত্যিই তোমার বিয়ে দিতে হবে। তোমার মতো অবাধ্য ছেলেকে চব্বিশ ঘণ্টা শাসনে রাখা দরকার।'

আর একদিন এল, হাতে একটা ঠোঙা, 'তোমার পেটের খবর কী!'

'সারা জীবনের শত্রু মিত্র হবে কি করে! কেবল এটা খাবো, ওটা খাবো করছে। বুড়ো বয়েসের লোভ।'

'এখন তোমার কি খেতে ইচ্ছে করছে? সত্যি বলবে।'

'হিং-এর কচুরি।'

অচলা লাফিয়ে উঠল, 'মাইরি বলছ?'

'মাইরি।'

'কি টেলিপ্যাথি দ্যাখো। আমি এনেছি, গরম ভাজছিল।'

আজকাল একটুতেই চোখে জল আসে। সামলাতে পারি না। নার্ভ দুর্বল হচ্ছে।

গত রবিবার সকালে এসে মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে ঝুলটুল ঝাড়লে। টুলে উঠে পাখার ব্লেড পরিষ্কার করছে, বললুম, 'পড়ে মরিস না যেন।'

হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, 'তুমি আছো কি করতে? পড়ার মতো হলে ধরবে।'

'তুই আমার জন্যে এত করিস কেন? কেউ তো করে না।'

'আগের জন্মের সম্পর্ক ছিল। মোটা মাথায় এটাও ঢোকে না।'

প্রতাপ চলে যাওয়ার কিছু পরেই অচলা এল। গম্ভীর। তার দীর্ঘ শরীর কিছুটা শ্লথ। খাটে আমার মুখোমুখি বসল। তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। ধারালো মুখ। খাড়া নাক। টানা টানা চোখ। লঘু গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হলো সখী?'

অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলুম, চোখে জল ওতলাতে ওতলাতে একেবারে উপচে দু'গাল বেয়ে ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। কাচের শারসিতে বৃষ্টির জলের মতো।

অপ্রস্তুত আমি। 'কি হলো অচলা! কেউ কিছু বলেছে!'

হুমড়ি খেয়ে আমার কোলে পড়ল। রাখবো না, রাখবো না করেও চওড়া পিঠে হাত রাখলুম। অচলা কান্নার আবেগে ফুলছে। খোঁপা ভেঙে পড়েছে। অনেক চেষ্টার পর বললে, 'আমার বিয়ে।'

'সে তো আনন্দের কথা রে! ভীষণ আনন্দের। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।'

অচলা আমার কোলে মুখ গুঁজেই বললে, 'তোমাকে ছেড়ে আমি থাকবো কি করে!'

মেয়েটা বয়সে বড় হলেও অভিজ্ঞতায় বড় হয়নি। যে কথাটা বললে সেই কথাটার মতো 'কথার কথা' আর দুটো নেই। আমরা সকলেই সকলকে ছেড়ে থাকতে পারি। একদিন দু'দিন একটু খালি খালি লাগে তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। যুবতী জানে না, এই বুড়ো জানে। বুড়ো এও জানে, শূন্যতার মতো পূর্ণতা নেই। একটা পাত্র, জল ভরছি, একের চার ভর্তি, তিনের চার ভর্তি, পরিপূর্ণ করে দিলেও ছলকে পড়ে যাবে, উবে যাবে: কিন্তু শূন্যতা একেবারে পরিপূর্ণ। তুমি যখন আছ, তখন আমার ভেতরে তুমি আংশিক আছ। তুমি যখন নেই তখন তুমি পুরোটাই আছ। বাইরে থাকাটা থাকা নয়, ভেতরে থাকাটাই প্রকৃত থাকা।

অচলা মুখ তুলে আঁচলে চোখ মুছল। বললে, 'তোমার খারাপ লাগছে না!'

'লাগলেও কিছু করার নেই। আমার শূন্যতার গভীরতা আরো বাড়ল।'

'কিছু করা যায় না?'

'কিছুই করা যায় না।'

অচলা আরো কিছুক্ষণ বসার পর উঠল, 'তোমার সোয়টার হয়ে গেছে।'

'শীতও আসছে।'

অচলা চলে গেল ধীর পায়ে। দেখছি আমি পেছন থেকে। হঠাৎ মনে হলো, চলে গেল না, অচলা সানাই হয়ে গেল। দূর থেকে দূরে ভেসে যাওয়া সানাইয়ের সুর। ভয় পাচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে হলো ঘুড়ি, অচেনা আকাশে উড়ে যাওয়া।

এই যে দেনেঅলা ভগবান, লেনেঅলা ভগবান! শুনে রাখ—তোমার বহুত অহঙ্কার, মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা কর, রাজা কর, ফকির কর, একটা কথা জেনে রাখ, মানুষ তোমার পৃথিবীতে আসে না, মানুষ আসে মানুষের হৃদয়ে। প্রেমে বড় হয়, অবশেষে চিতার আগুনে দগ্ধ হয়। তোমারই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা তোমার অদৃশ্য সিংহাসনে বসে, বিশ্বজোড়া কান পেতে শোনো,

তোমার উৎসব-ধারা যাওয়া-আসা
দুকূল ধ্বনিয়া
ছুটে চলে যায়।
তোমার নর্তকী দল বিরহ মিলন
ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তাল
ছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে
নূপুর-মন্দ্রিত
দুঃখ আর সুখ
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে নিয়ত
স্পন্দিত
করে ধুক্ ধুক্॥

আপনি ভালো থাকুন। খেলে যান! মাঠ আপনার, বল আপনার, নিয়ম আপনার। বাঁশী আপনার, ফুঁ আপনার।

দুই

এখনও আছে। এমন পরিবার এখনও আছে। বিরাট যৌথ পরিবার। পরিবার যখন বিশাল, বাড়িটিও সেই অনুপাতে বৃহৎ। অতীতে এঁদের পূর্বপুরুষ এই কায়দার গৃহ তৈরি করেছিলেন। কতদিকে যে বিস্তার! এদিক, ওদিক, সেদিক। দালান, উঠান, বাগান। এ-কালের বাড়িতে একটা সিঁড়ি করতেই রেস্ত ফাঁক। এই বাড়িতে বড়োয়, ছোটোয় মিলিয়ে সাতটা সিঁড়ি। প্রধান সিঁড়ি তরতরিয়ে তিনতলায় উঠে গেছে। এরপর সব শাখা-প্রশাখা, কোনোটা নীচে নেমেছে। কোনোটা প্যাঁচ মেরে হাজির হয়েছে কোনো গুপ্ত মহলে। রহস্যেঘেরা একটি বাড়ি। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

এই বাড়িতে তিনপুরুষ ধরে হেসে খেলে জীবন কাটাচ্ছেন মিত্তিররা। পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন নবাব-সরকারে দেওয়ান। রমরমার শুরু সেইকাল থেকে। এই পুরুষেই আর এক মিত্তির খাগড়ায় ফেঁদে বসলেন কাঁসার ব্যবসা। জমাটি কারবার। সারা ভারতে! এক মিত্তির ঢুকলেন গালার ব্যবসায়। ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত দৌড়। পরিবারে ঢুকে পড়ল বিলিতি হাওয়া। তিনি আবার মেম বিয়ে করলেন। এই বাড়ির একটা দিকে গেলে এখনও মনে হবে বিলেতে এসেছি। কাচের ঘর। বিলিতি আসবাব, এমন কী একটা ফায়ার প্লেস। পরিত্যক্ত বাবুর্চিখানা। উঁচু বেদিতে যিশুর মূর্তি বিশাল। বড়ো, বড়ো বাতিদান। এখনও পরিচর্যা হয়। সব ঝকঝকে, তকতকে। মনে হবে, এই একটু আগে প্রার্থনা হচ্ছিল। সুর ভেসে বেড়াচ্ছে।

এরপরেই মিত্তিররা ঘুরে গেলেন শিক্ষার জগতে। সেখানেও তাঁরা অপ্রতিহত। সেই পুরুষেরই চার ভাই, আর এক বোন এখন রাজত্ব করছেন। এখন তাহলে আমরা মিত্তির বাড়িতে প্রবেশ করি। সময়, সকাল ন-টা। আজ রবিবার। সব মিত্তিরই আজ বাড়িতে। বড়ো মিত্তির ডাক্তার। মেজো মিত্তির অধ্যাপক। সেজো মিত্তির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। চতুর্থ মিত্তির ফ্যাশান ডিজাইনার। বেশিরভাগ সময় প্যারিসে থাকেন। বড়ো আর মেজোর পর একটি বোন। আদরের ডাক নাম কুসী। স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাড়ি আর ভাইদের সামলাবার জন্যে সব ছাড়তে হয়েছে। বিয়েও করা হল না। আর হবেও না। মায়ের মতো চারটে ভাইকে সামলাতে হয়। সবাই বলে, একেই

বলে স্যাক্রিফাইস। অতি সুন্দরী। লেখা-পড়ায় সেরা। অসম্ভব ভালো সেতার বাজায়। এক সহপাঠী ভালোবাসত। জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। এমন প্রেম! শেষে বিরক্ত হয়ে বিলেত চলে গেল। এখনও মাঝে মাঝে ফোন করে। বেশি কথা বলে না। বড়ো বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কুসী সেই প্রেমিককেও সামলায়। পরের জন্মে মিলন হবে। আমরা দুজনে সুইজারল্যান্ডে জন্মাব নেক্সট টাইম।

মিত্তির বাড়ির গেটটা একটা দেখবার জিনিস। অতীতের জিনিস, ঢালাই ডিজাইন। যেমনি ভারী, তেমনি বিশাল। হাতি গলে যেতে পারে। বাগানের পথ ধরে কিছুটা হাঁটতে হবে। বেশ পরিচর্যার বাগান। দুজন পার্মানেন্ট মালি আছেন। পুরোনো আমলের লোক। মিত্তিরদের একটা গুণ আছে, পরকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা।

ঢুকতে ঢুকতে বোঝা যাচ্ছে, বৈঠকখানায় ভীষণ একটা কাণ্ড হচ্ছে। বড়ো ভাই বিমলের গলা, 'আহা, আহা, অতটা উঁচু নয়। অতটা উঁচু নয়, আর একটু নীচে নামবে। তুই কি স্বর্গে টাঙাতে চাইছিস?'

ছবি টাঙানো হচ্ছে। টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার ইলেকট্রিসিয়ান ডাকু। মিত্তিরদের খুব প্রিয়। দাঁড়িয়ে আছে ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে। বেশ বড়োসড়ো মাপের একটা ছবি দু-হাতে ধরে আছে। হাইট নিয়ে গোলমাল। দেয়ালের কতটা উঁচুতে ঝুলবে। বড়ো আর মেজোর মতের মিল হচ্ছে না। মেজো নির্মল বললে, 'দাদা, সব ব্যাপারে বাগড়া দেওয়া তোমার একটা স্বভাব।'

'কী রকম?'

'ছবিটা আমরা নীচে দাঁড়িয়ে দেখব, তাই তো? ছবি দেখার জন্যে টেবিলে উঠব না! অতটা টঙে তুলে দিলে ছবি দেখবে টিকটিকি।'

'বেশ, তুই ছবিটা কোথায় দিতে বলছিস? মেঝের কাচে? স্কার্টিং-এর উপরে?'

'আমি পাগল নই।'

'অর্থাৎ, আমি পাগল।'

'পাগল ছাড়া ওই কথার এই মানে কেউ করবে না।'

'ছবি টাঙাতে হবে না। ডাকু, তুই নেমে আয়।'

'যা ব্বাবা, আধঘন্টা ছবি ধরে দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকার পর এই ডিশিসান!'

বিমল বললে, 'তোর টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। টাকা নাও চলে যাও।'

'আপনাদের সঙ্গে আমার টাকার সম্পর্ক?'

বিমল বললে, 'আমি খুব রেগে গেছি।'

'রাগছেন কেন? মেজদা তো যুক্তিপূর্ণ কথাই বলছেন।'

'ওর যুক্তি ওর কাছে থাক। আমি আমার যুক্তি, আমার সুপরিপক্ক বুদ্ধিতে চলব।'

মেজোভাই অধ্যাপক নির্মল মিত্তির বললে, 'ঠিক আছে তাই চলো, আমি চললুম। আমার সময়ের দাম আছে। দশ বান্ডিল পরীক্ষার খাতা পড়ে আছে।'

নির্মল গটমট করে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় কুসী আর সেজো ভাই কমল বকবক করতে করতে বাইরে থেকে ভিতরে এল। নানা মাপের, নানা রঙের ব্যাগ নিয়ে। প্রতি রবিবার এই জুটি বাজারে যায়। মিত্তির বাড়ির এই প্রথা। নির্মল আটকে গেল।

বিমল বললে, 'তুই আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছিস যা। ফিরে এসে দেখবি, ছবির বদলে আমি ঝুলছি!'

কুসী অবাক। বেপট জায়গায় তার পড়ার টেবিলটা। দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছ-ফুট লম্বা একটা ছেলে। কুসী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এ কী! প্রকাশ্য দিবালোকে কে গলায় দড়ি দিচ্ছে!'

ডাকু বললে, 'দিদি! আধঘন্টা, দাঁড়িয়ে আছি টেবিলে। দড়ি পেলে নিজেই ঝুলে পড়তুম।'

'ওটার উপর কে উঠিয়েছে তোকে?'

'বড়দা, মেজদা। এই যে ছবি, ঝোলাতে হবে। দেখো তো দিদি, কোন হাইটে ঝোলালে ঠিক হবে!'

'ছবি? দেয়ালে? ওই সদ্য রং করা সুন্দর দেয়ালে তুই পেরেক ঠুকবি? কার হুকুমে? নেমে আয়।'

ডাকু ধাম্ করে লাফ মারল টেবিল থেকে।

বিমল বললে, 'একটা ঐতিহাসিক ছবি। অতুলনীয়, অনির্বচনীয়। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশ লাল। এক পাল সাদা গোরু বৃন্দাবনের ধুলো উড়িয়ে ঘরে ফিরছে। বংশীধারী কৃষ্ণ মুরারী চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এই ছবিতে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, সংস্কৃতি সব মাখামাখি হয়ে আছে।'

কুসী বললে, 'দেয়াল দাগরাজি করে ইতিহাস, ভূগোল কোনো কিছুই ঝোলানো যাবে না।'

'তাহলে ছবিটা কিনলুম কেন?'

'কেন কিনলে, সে তুমিই জানো। বাড়ি রং করাবার আগে তোমাদের প্রত্যেককে আমি বলেছি। যেখানে সেখানে ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে বাড়িটাকে পান-বিড়ির দোকান করা চলবে না। আর যেখানে যেখানে ছবি ঝোলাবার ব্যবস্থা করে রাখা আছে, সেইখানেই ছবি ঝোলাতে হবে, তার বাইরে কোথাও নয়।'

'কুসী এই দেয়ালটা একটি ছবি চাইছে।'

'কার কাছে চাইছে? তোমার কাছে? আমার কাছে চায়নি।'

'মেজোর কাছেও চেয়েছে।'

নির্মল সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'এসব ব্যাপারে আমার কোনো মত নেই। কুসীর মতই আমার মত। আমি তোমার মতো ইনডিসেন্ট কাজ কখনও করি না। করবও না। যত হাতুড়ে ব্যাপার সব তোমার।'

বিমল রেগে গিয়ে বললে, 'হোয়াট ডু ইউ মিন? আই অ্যাম হাতুড়ে ডাক্তার? এর আগে তুই একবার গোরুর ডাক্তার বলে আমাকে জনসমক্ষে হেয় করেছিস।'

কুসী হাসতে হাসতে বললে, 'বড়দা তোমার বাংলা অনেক ইমপ্রুভ করেছে। বিভূতিবাবুর কোচিং-এ যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি মানে! আই অ্যাম রাইটিং অ্যান উপন্যাস। তিনটে চ্যাপটার কম্‌প্লিট। ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস। গগনে পূর্ণ শশী। নদী সকল জল ভারে ভারাক্রান্ত...'

নির্মল বললে, 'অসাধারণ! লক্ষ্মীর পাঁচালি আর কালিদাস পাঞ্চ।'

ডাকু মেঝেতে বসে পড়েছে। ছবিটা কোলের কাছে খাড়া। সে হঠাৎ বললে, 'এই ইতিহাস আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আর কতক্ষণ ধরে বসে থাকব! ভূগোল চুরমার হয়ে গেলে আমি জানি না।'

কমল বললে, 'আমি বলি কী, ছবিটা এখন কাগজ মুড়ে রাখা হোক, পরে একটা কমিশন বসিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। আজ রবিবার, কত রকম রান্নার ব্যবস্থা! সব মাটি হয়ে যাবে!'

বিমল ভোজন রসিক। কমল ভালো চাল চেলেছে। বিমল ডাকুকে বললে, 'যা, যা ছবিটা তুই নিয়ে যা। পৃথিবীতে কত ভালো ভালো ছবি আছে। সব ছবিই কি আর টাঙানো যায়!'

ডাকু হাঁ হয়ে গেল। বিমল এইবার বোনকে জিজ্ঞেস করলে, 'আজকের মেনুটা তাহলে কী করলি!'

কমল বললে, 'আমার কাছে শোনো।'

কুসী লটবহর নিয়ে ভিতরে চলে গেল। সেখানে দুটি অসাধারণ চরিত্র আছে। মেয়েটি এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। ভারি ভালো মেয়ে। তার নাম গান্ধারী। আর একজন, বিপিন। কর্তাদের আমলের। আগে বলা হতো, নায়েব। একাল বলবে, ম্যানেজার। রসিক মানুষ। সদাশিব। কুসী এদের নিয়েই এত বড়ো একটা সংসার ম্যানেজ করে।

বিমল বললে, 'মেনুটা শোনার জন্যে ভিতরটা কেমন যেন উতলা হচ্ছে।'

কমল ভারী একটা সোফায় বসে পড়ল, 'চা না হলে ঠিক মেজাজ আসছে না।'

বিমল চিৎকার করল, 'অ্যায় কে আছিস?'

কমল বললে, 'একেবারে বিয়ে বাড়ির মেনু। প্রথমেই হবে সেইটা, যেটা তুমি ভীষণ ভালোবাসো—ভেটকি মাছের ফিলে এনেছি। মাস্টার্ড দিয়ে ফ্রাই যা জমবে না!'

'ফ্রাই!' ডাক্তার আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

গান্ধারী চা নিয়ে আসছে। ডাকু যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়িয়েছে। গান্ধারী বললে, 'দিদি তোমাকে ভিতরে ডাকছে।' ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ডাকু গটগট করে অন্দরের দিকে এগোল। অনেকটা যেতে হবে। করিডর গোটা দুয়েক বাঁক নিয়ে পৌঁছেছে ভিতর মহলে। বাগান ঘেরা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর। এই খাবার ঘরের নাম রাখা যেতে পারে, 'অন্তরঙ্গ', পারিবারিক ভোজনকক্ষ। আর একটা খাওয়ার ঘর আছে। সে খুব কেতার। কত্তাদের আমলে সায়েব-সুবোরা আসত। ইংলিশ স্টাইল। এই মহলের উত্তর দিকে কমল কায়দা করে একটা সুইমিংপুল মতো করেছে। মিত্তিররা কদাচিৎ সুইমিং করে। চারটে হাঁস সর্বক্ষণ সেখানে ভাসছে। সে এক শোভা—

ডাকুকে কুসী বললে, 'বোস। কথা আছে।'

বড়ো একটা কিচেন টেবিল। কাঠের দু-পাশে দুটো-লম্বা কাঠের বেঞ্চি। এই টেবিলে আনাজ-পত্র কাটা হয়। কুসীর বিলিতি কায়দা। কাটাকুটি সব কিচেন নাইফে করে। ডাকুর দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে, নিজের কাপটা টেনে নিল।

এক চুমুক চা খেয়ে বললে, 'শোন, ছবিটা কিন্তু খুব সুন্দর। বড়দার মনে দুঃখ দিতে চাই না। তুই ওই দেয়ালেই সেন্টার করে, আলোটার এক হাত নীচে ছবিটা লাগিয়ে দে। কিচ্ছু বলবি না। ঠিক আছে? আজ দুপুরে তুই এখানে খাবি। বউকে আনবি।'

বাইরের ঘরে তিন ভাই একসঙ্গে হয়েছে। মাছ ধরার গল্প হচ্ছে। বিমলের মাছ ধরার নেশা। ডাকু ইলেকট্রিক ড্রিল হাতে টেবিলে উঠে পড়ল। ড্রিলের শব্দে তিন মিত্তিরের মাছ ধরা থেমে গেল।

বিমল আঁতকে উঠে বললে, 'এ কী রে? কী করছিস তুই! কুসীর দেয়াল। ছাল ছাড়িয়ে নেবে। যাঃ, দেয়ালের সর্বনাশ হয়ে গেল। এ তো ছেলে নয়, সন্ত্রাসবাদী!'

ডাকু নীরব। ঝপাঝপ ছবি ঝুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কুসী ঘরে ঢুকে বললে, 'বাঁদিকটা একটু উঠবে। খুব সামান্য। অ্যায়! ঠিক আছে।'

বিমল বললে, 'কুসী! তুই অনুমতি করেছিস?'

কুসী কোনো উত্তর দিল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল। বিমল অভিভূত, 'ফ্যান্‌টাসটিক! একেবারে মায়ের মতো। আমি জন্ম, জন্ম ধরে কুসীর ভাই হতে চাই। তোমরা?'

নির্মল আর কমল সমস্বরে বললে, 'আমরাও।'

দরজার কাছ থেকে ডাকু মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'আমিও।'

কমল রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। রান্না করা তার হবি। বিমল আর নির্মল দুজনেই 'ইমোশানাল'। লক্ষ করলেই দেখা যাবে দুই মিত্তিরের চোখে জল। ঘরে একজন এলেন। মিত্তির বাড়ি অবারিত দ্বার। যে কেউ যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। ঘরে ঢুকলেন জগমোহনবাবু। নামকরা শিক্ষক ছিলেন। এখন উন্মাদ। একমাত্র কৃতী ছেলে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর থেকেই একটু একটু করে মস্তিষ্কের সুস্থতা হারালেন। ছেলেটির মৃত্যুতে পাড়ার সবাই হায় হায় করেছিল। আজও করে। যেমন রূপ ছিল তেমনি গুণ। মৃত্যু এমন এক পূর্ণচ্ছেদ কার জীবনে কখন যে পড়বে ভগবানের কলমই জানে।

এখন বেশিরভাগ সময়ই নাটকের ডায়ালগ বলেন। ঘরে ঢুকলেন এই বলতে বলতে, 'আওরঙ্গজেব! তোমার মাকে তুমি নিজের হাতে মারলে! ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড। কালমেঘ খাও, কালমেঘ। গজানন ও গজানন, পঞ্চাননকে নিয়ে গুম মেরে বসে আছ কেন? আজ খাওয়া জোটেনি? হাওয়া খাও, হাওয়া। ভোরের হাওয়া। ভোরের হাওয়ায় চোখের জল থাকে। রাতের কান্না। তারাসুন্দরীর চোখের জল। আমি জানি, সব জানি।

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore

এস গজানন এক হাত দাবা হয়ে থাক। সেই জোচ্চোর ভগবান, I will

teach you a lesson! তুমি খুব বেড়েছ। নস্ত্রাদামুস। আকাশে ওড়াও নানা রঙের ফানুস।'

জগমোহনবাবু থপাস করে মেঝেতে বসে পড়লেন। মোটাসোটা মানুষ। সেইবলে না তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, গায়ের রং ঠিক সেইরকম। বসে বসে দুলছিলেন, হঠাৎ বুক ফাটা কান্না। বিমল কারো দুঃখ সহ্য করতে পারে না। তার নিজের রোগী মারা গেলে রোগীর আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে নিজেও কাঁদতে থাকে। এই সেদিন হেপাটাইটিসে একটি ছাত্রী মারা গেল, ভোজন রসিক বিমল সারাটা দিন না খেয়ে রইল। দাদার সঙ্গে পুরো পরিবারের উপবাস। গান্ধারী বললে, 'যে-কালে বড়দা খাবে না, সে-কালে আমি খাব!' বিমল নিজের মনেই বললে, 'এই পৃথিবীতে আর একদিনও বাঁচতে ইচ্ছে করে না!'

জগমোহনবাবুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। খুব করুণ গলায় ক্ষমা চাইছেন, 'বাবা বিমল। তোমরা খুব বিরক্ত হচ্ছ, তাই না? কী করব বলো! একার সংসার, কতদিকে চোখ রাখব! একটু ফাঁক পেলেই ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন।'

স্বামীর হাত ধরে ওঠাতে, ওঠাতে বলছেন, 'চলো বাড়ি চলো। তোমার রাজহাঁস ফিরে এসেছে।' জগমোহন অনেকক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কে? কোন ইয়ার?'

রাজহাঁস বললেই জগমোহন একেবারে শান্ত, বাধ্য মানুষ। পাগলের বিশ্বাস, তাঁর ছেলে রাজহাঁস হয়ে গেছে। একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। জগমোহন স্ত্রীর হাত ধরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় কোনদিকে পা ফেলছেন, কোনো খেয়াল নেই।

বৈঠকখানায় একটা কিছু হচ্ছে। কী হচ্ছে দেখার জন্যে কুসী চলে এসেছে। প্রতিবেশী লক্ষ্মীবাবু এসেছেন। যথারীতি ধোপ দুরস্ত, পরিপাটি সাজ-পোশাক। কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা সাদা ফতুয়া পাঞ্জাবি। ঝুলে এক সাইজ ছোটো চিনে-পাজামা। একটা অ্যাম্বার রং-এর কাঁধে-ঝোলা ব্যাগ। এক মাথা সাদা চুল, অবিন্যস্ত। এইটাই স্টাইল। পাড়ায় ভদ্রলোকের নাম, ভয়ের ফেরিওয়ালা। এক একদিন এক এক রকম ভয় আমদানি করেন। দেখা যাক আজ কী বেরোয় ঝুলি থেকে।

প্রথমেই খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'ঢুকে পড়েছে।'

মুখে যতটা সম্ভব ভয় এনে বললেন, 'ঢুকে পড়েছে। এ পাড়াতেও এসে গেল। কাল সন্ধেবেলা একজন আমার কাছে এসেছিল। ইয়া ভুঁড়ি। চালতার

মতো মুখ। বলে দিতে হয় না, দেখলেই বোঝা যায় আন্ডারওয়ার্লডের লোক। এ কে ফর্টি সেভেন। সেকেন্ডে তিরিশটা। চালুনি-ঝাঁজরা। বলে কী মিত্তির বাড়িটা ম্যানেজ করে দিতে পারেন? আপনাকেও একটা এগারোশো স্কোয়্যার ফুট ফ্রি দিয়ে দোবো। ক্যাশ টাকাও পাবেন।'

বিমল বললে, 'সে আবার কি?'

'শোনো, অনেক রকম যুগের নাম শুনেছ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। এইবার আর একটা যুগের নাম শোনো, 'প্রোমোটার-যুগ।' একটু সাবধানে থেকো। তোমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ। হুটহাট করে এখানে-সেখানে একা একা চলে যাও। কবি কবি ভাব। ঘাড় ধরে গাড়িতে তুলবে, তারপর প্যাঁচ মারবে। তোমাদের বাকি তিনটেও তো সত্যযুগের মানুষ। এটা যে ঘোর কলি মনেই নেই তোমাদের। তোমরা সিকিউরিটি নিয়ে চলা ফেরা করো। থানায় জানিয়ে কোনো লাভ নেই। ওদের নিয়ম হল, আগে খুন, পরে অনুসন্ধান।'

'আপনি প্রথমেই খুনে চলে গেলেন?'

'কি আশ্চর্য! তোমরা জেগে ঘুমোও নাকি? রোজ খবরের কাগজ খুলে কি দেখো? রক্তারক্তি। তোমাদের চারটে ভাইকে শেষ করে দিতে পারলেই মিত্তিররা ফিনিশ। আমিও বাদ যাব না।'

'আপনি বাদ যাবেন না কেন?'

'তোমরা অনেক কিছু পড়েছ, একটু যদি গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে! এই দেখো, আমি বুঝিয়ে দি। ধরো, তোমরা ধরাধ্ধড় খুন হলে। তারপর একটা ইনভেস্টিগেশন হবে। এই মেয়েটা পুলিসকে বলে দিলে, লক্ষ্মীকাকাবাবুর কাছে একজন এসেছিল। তার মানে, তোমাদের মার্ডার কেসে আমি একজন সাক্ষী। আধুনিক অপরাধীরা সাক্ষীকে খতম করে দেয়। জেমস হ্যাডলি চেজের ওই বইটা পড়ে দেখো, 'ভালচার ইজ এ পেশেন্ট বার্ড।'

লক্ষ্মীবাবু সবার মুখ একবার দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় পেয়েছে? পাওয়ারই কথা। তবে জেনে রাখ, এইরকম ঘটনা ঘটতেই পারে, এখনও ঘটেনি। প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের ডাক্তারের শাস্ত্রে আছে, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। মেঘ দেখলে আমরা যেমন ছাতা বের করি, সেই রকম প্রোমোটার দেখলে কী বের করব? ভাবো, সবাই মিলে ভাবো। যাক্, রবিবারের নৈবেদ্য গেল কোথায়? মিত্তির বাড়ির ফেমাস। মুড়ি, তেলে ভাজা আর চা—যত পারিস তত খা।'

'এসে গেছে।' গান্ধারীর গলা।

মাঝারি মাপের দুটো ধামায় মুড়ি আর গরম তেলে ভাজা। একটা ডিশে নুন, কাঁচা লঙ্কা, আদা কুঁচি।

দশ বারোটা খালি বাটি। মুড়ি তোলার জন্যে স্টেনলেস স্টিলের দুটো হাতা।

॥ ২॥

বড় মিত্তির বিমল এক অসাধারণ মানুষ। শিশুর মতো সরল। ডাক্তারি করার সময় রুদ্র নারায়ণ। তখন কে রুগি, কেমন রুগি, এ-সব দেখে না। তখন লড়াই। রোগের সঙ্গে বৈদ্যের লড়াই। তখন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর সেবার সমন্বয়ে দীনের ভগবান। আর গভীর রাতে যোগী। বিমল সেই সময়ে কিছুক্ষণ লেখে। লেখক হওয়ার জন্যে লেখে না। লেখে মনের প্রকাশের আনন্দে। কি লিখেছে দেখি। শিরোনাম 'মান-অপমান'।

*　　*　　*

যেদিন পৃথিবীতে প্রবেশ করলুম সেইদিন থেকেই শুরু হল অপমানিত হওয়ার পালা। পদে পদে অপমান। অপমান আমাদের জীবন সাথী। পারস্পরিক ব্যাপার। হয় আমি অপমান করব, না হয় কেউ আমাকে অপমান করবে। হয় আমি কারোকে কাটা কাটা বাক্যবাণে জর্জরিত করব, না হয় কেউ আমাকে করবে। পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তেও শরীরে লেগে থাকবে একটা জ্বালা, মনে একটা ক্ষোভ, জীবনের হাতে কি জুতো-পেটাই না খেলুম! উঠতে কোস্তা বসতে কোস্তা।

যখন অবোধ শিশু, কান্নার পর্যায়ে আছি তখন কেউ না কেউ বলেছে, 'চেল্লাচ্ছে দেখ, কানের পোকা বের করে ছাড়বে। এই কে আছিস, দূর করে বাইরে ফেলে দিয়ে আয় জানোয়ারটাকে।' ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মা বলেছেন, 'কেঁদে না মরে গিলে মরো না! এই শয়তানটা আমার হাড়-মাস কালি কালি করে ছাড়ল। মাঝে মাঝে মনে হয় গলা টিপে শেষ করে দি!' পুত্রের অপমান পিতাতেও সময় সময় বর্তাত, যেমন বাপ তার তেমন ছেলে। বাপ বকাসুর, ছেলে ঘটোৎকচ।

জ্ঞান হল। পড়তে বসলুম। অক্ষরের জগৎ, সংখ্যার জগৎ। একই 'ইউ'। আমব্রেলার আগে 'অ্যান', ইউনিভার্সিটির আগে 'এ'। শুরু হয়ে গেল

খ্যাচাখেচি, ধস্তাধস্তি। এ, অ্যান, দি, দ্যাট, হ্যাজ, হ্যাভ, ইজ, অ্যাম, আর। বলো, পীড়িত বানান কী! লেখো, লেখো, স্লেটে লেখো। আহা, মানিক আমার। দ্যাখ, দ্যাখ, দুটোতেই দীর্ঘ ঈ মেরে বসে আছে। একটু বেশি পীড়া। ট্রিটমেন্ট করে পরের দীর্ঘটা ছাড়াতে হবে। এই, উসকো কান পাকাড়কে ইধার লাও। এই ই, ঈ, উ, ঊ-এর ঠেলায় বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে দু-সুতো বড়ো হয়ে গেল। যতদিন না গোঁফ গজাল, ততদিন প্রহরে প্রহরে প্রহার আর নির্বিচার টানাটানি। ভূপতিত আর ভূপাতিত, কী তফাত! বল গাধা! দশ সের সরু চালে কুড়ি সের মোটা চাল পাইল করে পাঁচসিকে সের দরে বিক্রি করলে লাভ কত হবে? হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি দেখলে ওরে বাঁদর সারাটা জীবন যে রিকশা টানতে হবে! এবম্বিধ তিরস্কারের পর এমন অঙ্ক কষলুম, পুত্রের বয়স পিতার চেয়ে দশ বছর বেশি হয়ে গেল। শিক্ষকমহাশয় একহাতে ডাস্টার এক হাতে বেত নিয়ে রুদ্রনৃত্য শুরু করলেন। বিনীত ভাবে যেই বলেছি, 'স্যার! এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন সামান্য ব্যাপারে! উলটে নিলেই তো হয়, যার বয়েস বেশি সে পিতা, যার বয়েস কম সে পুত্র।' সঙ্গে সঙ্গে গাধার টুপি হাতে ছুটে এল স্কুলের দারোয়ান। 'গাধাটার মাথায় চাপা। জিভ বের কর, কান ধর।' শুরু হল স্কুল পরিক্রমা। দৃশ্য দেখে পণ্ডিতমশাই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'ঘোর কলি! এরপর দেখবে, মেয়ের গর্ভে মা জন্মাবে!'

এরপর চাকরি। পাহাড়ের যেমন চড়াই উতরাই থাকে, মাঝে মাঝে উপত্যকা বিস্তীর্ণ। সেইরকম চাকরি জীবন হল অপমানের উপত্যকা। দশটা থেকে পাঁচটা অপমানের তাঁবুতে সার্কাসের খেলা। বড়ো প্রভু, মেজো প্রভু, ছোটো প্রভু, প্রভুর প্রভু, যার কাছেই যাওয়া যাক, সেই বুঝিয়ে দেবে তুমি অন্নদাস। প্রতি মুহূর্তে বোধ হবে, ওরে পেট তোর জন্যে করি আমি মাথা হেঁট।

তুলসীদাস একটি বাস্তব পরামর্শ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন,

তুলসী উহাঁ যাইয়ে, যাঁহা আদর না করে কোই।
মান ঘাটে, মন্ মরে, রামকো স্মরণ হোই।।

হে তুলসী! যেখানে গেলে তোমাকে কেউ আদর করবে না, তুমি সব সময় সেইখানেই যাবে। কেন যাবে! সেখানে যাবে এই কারণে, উপেক্ষা আর অপমানে তোমার মন অহংকার মুক্ত হবে, মরমে মরে যাবে, আর তখনই

তোমার মনে জগৎপিতার চিন্তা আসবে।

কীভাবে মানুষকে অপমান করা যায়, তারও একটা শাস্ত্র আছে, সেটাও একটা আর্ট। গ্রাম্য মানুষ গোদা গোদা গালাগাল দেবে, আর বড়ো মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিজীবী মানুষ, তাঁদের কায়দাটা অন্যরকম। সূক্ষ্ম, কিন্তু ভয়ংকর। ছুরি মারলে রক্ত বেরোবে। সেরে গেলে স্মরণে থাকবে না। বাক্যের চোট সাংঘাতিক। মনে রক্তপাত। কোনো ওষুধ নেই। বাক্যের খোঁচা অতি ভয়ঙ্কর। তুলসীদাস বললেন, 'মারে শব্দে সে।'

আর্টিস্টিক অপমানের নমুনা :

হুইস্টলার ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ততোধিক বিখ্যাত ছিল তাঁর মুখ। ছবি আঁকার ক্লাসে এক ছাত্রীকে প্রশ্ন করলেন,

'তুমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছ?'

'ইয়েস স্যার!'

'দেখি কি আঁকলে?'

মেয়েটি ক্যানভাস নিয়ে এগিয়ে এল। শিল্পগুরু দেখে প্রশ্ন করলেন,

'হাতটা আঁকলে লাল রঙে, কনুইয়ের কাছে সবুজ ছায়া মারলে কোন আক্কেলে?'

'স্যার, আমি যা দেখি, যেমন দেখি, ঠিক সেই ভাবেই আঁকি।'

শিল্পী বললেন, 'বেশ বেশ, খুব ভালো, বাট মাই ডিয়ার দি শক উইল কাম হোয়েন ইউ সি হোয়াট ইউ পেন্ট'। যা দ্যাখো, তাই আঁকো, অতি উত্তম কথা, তবে নিজের আঁকা ছবি যখন দেখবে তখন ভিরমি যাবে।' ক্লাস ভর্তি ছাত্র-ছাত্রী। মেয়েটির মাথা হেঁট!

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস। অধ্যাপক সকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, 'তোমার নাম?' নাম বললুম। 'নিবাস?' বললুম, 'বরাহনগর।'

অধ্যাপক রসিকতা করলেন, 'আশা করি তোমার থেকে তোমার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই!' সামনের সারিতে ছাত্রীরা। তারা আমার এমত হেনস্থায় খিলখিল করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তর, 'আজ্ঞে না স্যার, বরাহরা আমার তালুকের প্রজা। আমি নগরপাল মাত্র।'

জন ড্রাইডেন, আমাদের পরিচিত নামকরা কবি। ছাত্র জীবনে সকলেই পড়েছেন ড্রাইডেন। ড্রাইডেন খুব পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর নিভৃত স্টাডিতে

সারাদিন বই মুখে বসে থাকতেন। একদিন তাঁর ক্ষুব্ধ স্ত্রী আক্ষেপের সুরে বললেন, 'লর্ড মিস্টার ড্রাইডেন, সারাদিন ওই পুরোনো পুরোনো বইগুলো নিয়ে অমন মশগুল হয়ে থাকো কী করে! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটা বই হয়ে যাই, তাহলে খানিক তোমার সঙ্গ পাওয়া যেত!'

কবি উত্তরে বললেন, 'বই হবে, তা বেশ ভালো কথা! একটাই অনুরোধ, বই যদি হও, তো একটা পাঁজি হোয়ো, তা হলে বছর বছর পালটাতে পারব।'

বিখ্যাত লেখক, সমালোচক কারলাইলের কথা আমরা জানি। কারলাইলের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। সকলেই তা জানতেন। লাগাতার দ্বন্দ্ব। স্যামুয়েল বাটলার একদিন বলে বসলেন, 'ঈশ্বর করুণাময়! কী ভালোই না করেছেন দু'জনের বিয়ে দিয়ে। তা না হলে চারজনের জীবন অতিষ্ঠ হতো।'

কী ভাবে! দুজনেই সমান। কারলাইল যদি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করতেন আর শ্রীমতী কারলাইল যদি অন্য একটি পুরুষকে বিয়ে করতেন তাহলে চারজনের জীবনেরই বারোটা বেজে যেত!

স্যার থমাস বিচাম ছিলেন একজন বিখ্যাত বাদক ও সংযোজক। একটা কনসার্টের জন্যে বিভিন্ন বাদকের পরীক্ষা নিচ্ছেন। এক যুবতী চেলো বাজাচ্ছে। বিচাম তাকে একটি টুকরো বাজাতে দিয়েছেন। বিচাম লক্ষ করছেন, মেয়েটি অনেকক্ষণ লড়াই করে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। যাই হোক কোনোরকমে শেষ করে মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'এরপর কি করব স্যার?'

বিচাম বললেন, 'গেট ম্যারেড!' আর কিছু করতে হবে না। বিয়ে করে ফ্যালো।

লুই দ্যা ফোরটিন্থ-এর রাজত্বকালে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের সম্পর্ক ভিতরে ভিতরে খুবই তিক্ত ছিল, কারণ ধর্ম। ক্যাথলিক উগ্রতা, পোপের ক্ষমতা, ইংল্যান্ডের প্রোটেস্টান্টদের কাছে অসহ্য মনে হতো। এক ইংরেজ এসেছেন রাজদরবারে। রাজা লুই তাঁকে নিয়ে গেছেন রয়াল আর্ট গ্যালারিতে। অতিথিকে দাঁড় করিয়েছেন একটি ছবির সামনে। লুই জানতেন ছবির সামনে দাঁড়ালেই যে কোনো প্রোটেস্টান্ট বেশ একটু ধাক্কা খাবে, আর সেইটাই তাঁর উদ্দেশ্য।

রাজা বললেন, 'এই হলেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু। আর ডানদিকের ছবিটা হল পোপের, আর বাঁদিকেরটা আমি।'

অতিথি বললেন, I humbly thank your majesty for this infor-

mation. আমি প্রায়ই শুনতুম, আমাদের প্রভুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তখন তাঁর দুপাশে দুটো চোর দাঁড়িয়েছিল। আমি এই ছবিটা দেখার আগে পর্যন্ত জানতুম না, সেই চোর দুটো কে, কে। এখন জানা গেল ইওর ম্যাজেস্টি। ধন্যবাদ!'

বিখ্যাত ডঃ জনসন যে কোনো কারণেই হোক নারী-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন। সকলেই তা জানত। তিনি মনে করতেন, মেয়েরা সব মহানির্বোধ। একদিন বিরক্তিকর রকমের বাচাল এক মহিলা জনসনকে পাকড়েছে। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ছে না। মহিলা এক সময় প্রশ্ন করছে—

'ডক্টর, শুনেছি, আপনি না কি মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সঙ্গ বেশি পছন্দ করেন!' জনসন বললেন, 'ম্যাডাম! আপনার ধারণা খুব, খুব ভুল। আমি নারীর সঙ্গ খুবই পছন্দ করি, তাদের সৌন্দর্য, প্রাণচাঞ্চল্য এবং তাদের নীরবতা। আই ভেরি মাচ লাইক দেয়ার সাইলেন্স।'

তুলসীদাসজির একটি দোঁহা আছে ঃ

ভাট্‌কে ভালা বোল্‌না চল্‌না বহুড়ীকে ভালা চুপ্‌।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষাবাদর, অজ্‌কে ভালা ধুপ্‌।।

যারা ভাট, তারা অনেক কথা বলবে, বহু পথ চলবে। কিন্তু বধূরা স্বল্পভাষী হবে। সেইটাই শোভন। সেইটাই কাম্য। ব্যাঙের কাছে যেমন বর্ষা, ছাগলের কাছে তেমন রোদই আনন্দের কারণ। নারীর নীরবতা অন্যতম একটা সৌন্দর্য। জনসন সেইটিই বললেন,

I like their beauty, I like their vivacity, and I like their silence.

জনসন আর ডিকেন্‌স দুজনেই খুব মজার মানুষ ছিলেন। কথা দিয়ে কামড়াতে পারতেন মোক্ষম। এক উচ্চাকাঙ্খী তরুণ লেখকের পান্ডুলিপি ফেরত দিলেন জনসন এই মন্তব্য লিখে, your manuscript is both good and orignal. But the part that is good is not orignal and the part that is original in not good. চালর্স ডিকেনসের কাছে একটি কবিতা সংকলন এল, নাম 'Orient pearls at Random Strung'। ঔপন্যাসিক ছোট্ট একটি চিরকুট লিখলেন কবিকে—Dear Blanchard, Too much string. Yours C.D.

কুসী বড়দার ঘর নিজের হাতে গুছোয়। প্রয়োজন হলে গান্ধারীর সাহায্য নেয়। সেই সময় কুসী দাদার লেখা পড়ে। আর তখনই তার বাবার কথা,

মায়ের কথা মনে পড়ে। যেমন গাছ, তেমন তার ফল! আর মনে পড়ে তার প্রেমিকের কথা। ভীরু, দুর্বল এক যুবক। কলেজ পাড়ায় সে তার বাবার কাগজ-কলম, খাতা-পেনসিলের দোকানে বসত। মায়া মাখানো দুটি চোখ। কলকাতার মতো দানবীয় শহরে এমন মায়াময় চোখ সহসা চোখে পড়ে না। ছেলেটির নাম ছিল সমুদ্র। বড়ো ঘরের ছেলে। বাবার হঠাৎ প্যারালিসিস। শয্যাশায়ী। সমুদ্র তার কলেজেরই ভালো ছাত্র ছিল। দু'বছরের সিনিয়ার। লেখা-পড়া ছেড়ে দোকান সামলাতে এল। মাথায় মাথায় দুটি বোন। দুজনেই ছাত্রী। ভালো ছাত্রী। সমুদ্রের কোনো অভিযোগ ছিল না। এইরকমই তো হয়। পৃথিবী তো অনিশ্চয়তা ভরা। সমুদ্র বলত 'লাইফ ইজ এ জার্নি। কখনও পথ ভালো, কখনও দুস্তর।'

কুসী প্রথম যেদিন ওই দোকানে খাতা কিনতে গিয়েছিল, তখন দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল বহুক্ষণ, তারপর সেই ঘোর কেটে যাওয়ার পর দুজনেই হেসে ফেলেছিল। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ। হরিহর ছত্রের মেলা। এরই মধ্যে 'ঠিক একজন' আছে 'ঠিক আর একজনের' জন্যে। সে বলে দিতে হয় না। সে চিনে নিতে হয় না; কিন্তু দেখা হওয়াটাই মুশকিল। হলেই যে 'দুই দাঁড়ের নৌকো' ভাসবে এমন কথা নেই। চল মুসাফির। অনন্ত জীবন পড়ে আছে। অদ্ভুত একটা ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল দুজনের। স্বামী-স্ত্রীর দেহগন্ধী ভালোবাসা নয়। সে কেমন? কাশফুল যেমন শরতের বাতাসে দোল খায়। সাদা মেঘ নেমে আসে সরোবরের নীল-সবুজে। সমুদ্রর কথা মনে পড়লেই কুসীর মনে আসে রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন—

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।

॥ ৩ ॥

আজ মিত্তিরদের বৈঠকখানা—একেবারে ফুল হাউস। কয়েকদিন হল মেজর এসেছেন। সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ার করার পর দেরাদুনে সেটল করেছেন। অনেকটা জায়গা নিয়ে অর্চার্ড অর্থাৎ ফলের বাগান। আপেল, চেরি, পিচ এইসব। বিদেশে যায়, ভারতের বিভিন্ন শহরে। মিত্তিরদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। বছরে একবার, দুবার আসেন। দারুণ চেহারা। প্রায় ছ-ফুট লম্বা।

সাহেবদের মতো গায়ের রং। অনেক ভাষা জানেন। তেমনি আমুদে। শরীরে রোগবালাই নেই। অর্থের অভাব নেই। একটি মাত্র শিক্ষিতা মেয়ে। এক সাহেবকে বিয়ে করে বিলেতে থাকে। মেজর অনেক বড়ো বড়ো লড়াই করেছেন।

কফি চলছে। মেজর হঠাৎ বললেন, 'ফাটবে কি ফাটবে না। কি বলো তো?'

সবাই সমস্বরে বললে, 'বোমা'।

'যে হেতু আমি বলেছি, সেই হেতু, বোমা ছাড়া আর কিছু নেই আমার জীবনে! আমি বলছি পটলের দোরমার কথা।'

'সে আবার কী?'

'আরে ধুর্ একঘেয়ে পাঞ্জাবী খানা খেতে খেতে বিরক্তি ধরে গেছে। একদিন ভাবলুম পটলের দোরমা করা যাক। পটলের পেটে পুর ঢুকিয়ে ময়দার ছিপি আটকে ছাঁকা তেলে নাড়াচাড়া করছি। গুণ গুন করে গান গাইছি। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ফটাস করে ফেটে মুখে, চোখে, বুকে। এর পরে হল কী, এক একটা কড়ায় ছাড়ি, আর দূর থেকে নাড়ি, ফাটবে কি ফাটবে না! আতঙ্ক!'

কুসী বললে, 'টেকনিকটা আপনি ঠিক জানেন না।'

'তা হতে পারে। তা আমি বলছিলুম, আজ লাঞ্চে দোরমা হলে কেমন হয়?'

বিমল বললে, 'অসম্ভব ভালো হয়। ওই আইটেমটা বহুদিন হয়নি।'

কুসী বললে, 'হবে।'

মেজর বললেন, 'জানি। তোমার ডিকশনারিতে অসম্ভব শব্দটা নেই।' গান্ধারী আবার কফি নিয়ে ঢুকছে। মেজর এলে গান্ধারী আরো চনমনে হয়ে ওঠে, 'কাপি, কাপি, কাপি।'

কুসী জিজ্ঞেস করলে, 'ওদিককার খবর?'

'সব ঠিক আছে ম্যাডাম। কেবল!'

'কেবল কী!'

'দুটো ডিম, পড়ে ফ্যাট্।'

'কার কর্ম?'

'কার আবার! অপকর্মের মাস্টার আমি।'

কুসী উঠে গেল। আর গল্প করার সময় নেই।

বিমল মেজরকে জিজ্ঞেস করলে, 'বেঁচে থাকতে কেমন লাগছে?'

'ভীষণ ভালো। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিন-চারবার জীবনকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছি তো, তাই জীবন আরো যেন ভালো লাগছে। সমস্যা আছে, বহু রকমের সমস্যা, বাধা-বিঘ্ন, তাতে কি হচ্ছে জানো, ড্রাইভিং স্কিল বেড়ে যাচ্ছে। জীবন হল গাড়ি চালানো। গুড ড্রাইভার সেফলি ডেস্টিনেশানে পৌঁছে যায়। ডেস্টিনেশান ইজ ডেথ। গাড়ি আর চালক দুজনেই হাওয়া। আর্মিতে রেগুলেশান বুট পরতে হতো। পায়ে খানকতক মোক্ষম কড়া তৈরি হল। সেই অবস্থায় ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধ। কখনও আত্মরক্ষার জন্যে এক পজিশান থেকে আর এক পজিশানে ছুটছি, কখনও চার্জ করছি। তখন কোথায় কড়া, কোথায় ব্যথা। মোদ্দা কথা দুটো, দুঃখটাকে ভুলতে পারলেই সুখ, মৃত্যুটাকে ভুলতে পারলেই জীবন। আর্মির লোকরা মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে করে না। একটু আগে পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, একটু পরেই মরে পড়ে গেল। আমি জানি বেঁচে থাকাটাই আমার কাজ। পৃথিবীটা বিশ্রী সুন্দর।'

নির্মল দর্শনের অধ্যাপক। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গান্ধারী ছিটকে ঘরে ঢুকে বস্ত্রহরণ পর্বের দ্রৌপদীর মতো মেঝেতে ভেঙে পড়ল। তার পিছনেই উগ্র মূর্তি কুসী। আঙুল উঁচিয়ে কুসী গান্ধারীকে ধমকাচ্ছে, 'ভবিষ্যতে যদি আর কোনোদিন দেখি! তুই খেতে পাস না?'

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল?'

কুসী রাগ সামলে নরম গলায় বললে, 'মেঝে থেকে চামচে দিয়ে ভাঙা ডিমের কুসুম তুলে বাটিতে রেখেছে, তাতে চুল, ময়লা, চায়ের পাতা, কী নেই! কাচ ভাঙা আর পেরেক ছাড়া। উনি সেটি ওমলেট করে খাবেন। পিশাচ! তোর শ্মশানে থাকা উচিত। মিত্তির বাড়ির ফ্রিজে কি গোটা ডিম নেই!'

এক দমে কথাগুলো বলে কুসী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে শান্ত হয়ে গেল। মেঝেতে বসে থাকা গান্ধারীর মাথায় হাত রেখে বললে, 'তুই এই বাড়ির কে? জানিস আমার একটা পিঠোপিঠি বোন ছিল। তোকে আমি আমার সেই বোন বলেই মনে করি। তুই আমার সেই বোন। তুই মেঝে থেকে ডিম তুলে ওমলেট খাবি?'

গান্ধারী বললে, 'দিদি, ওটা মেয়েদের অব্যেস। এই যে কাল তোমার হাত থেকে তেল পড়ে গেল। তুমি আঙুল দিয়ে একটু একটু করে তুললে। মেয়েরা পড়ে গেলেই তোলে।'

'সে তেলে রান্না হবে না গান্ধারী।'

'হবে না কি? আমি তো রান্না করে দিয়েছি।'

'সে কি রে?'

'তবে! পয়সার জিনিস ফেলে দোবো নাকি?'

*　　*　　*

মেজর যখনই আসেন ওই কাচের ঘরটায় থাকতে ভালোবাসেন। এই মিত্তিরদের পূর্ব পুরুষের একজন খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন না করলেও যীশুর ভক্ত ছিলেন। বাগানের এই দিকটায় ছোট্ট একটা উপাসনালয় তৈরি করেছিলেন, যার চূড়াটা চার্চের মতো। ভিতরটাও ঠিক সেইরকম। মেজর এই জায়গাটা খুব পছন্দ করেন। একা একা বেশ থাকা যায়। মিত্তির বাড়ির কোলাহল কানে আসে না।

শুয়ে শুয়ে ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবছিলেন। অনেক যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের কারণে অনেক মানুষ মেরেছেন। জয় করেছেন অনেক শত্রু ঘাঁটি; কিন্তু নিজের ভাগ্যকে জয় করতে পারেননি। সবচেয়ে শোচনীয় কুৎসিত পরাজয় হয়েছে নিজের অন্তরঙ্গ এক বন্ধুর কাছে। নিরীহ, ভোলেভালে, সজ্জন একটি মানুষ। বহু গুণের অধিকারী। মেজর আজও বুঝে উঠতে পারেননি, সেই মানুষটি কেমন করে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। এই দুনিয়ায় সবই সম্ভব।

নাম রেবেকা। মেজরের খুব পছন্দের নাম। প্রেমের বিয়ে। তরতরে মেয়ে। হাসতে, কইতে, গাইতে সবেতেই এক্সপার্ট। সাজতে? অমন সুন্দর করে নিজেকে সাজাতে কজন পারে! মেজর নিজের মনেই বললেন, সামথিং রং ইন মি। যতটা সময় নজর তাকে দেওয়া উচিত ছিল দেওয়া হয়নি। মেয়েরা অভিমানী হয়। ক্ষণে, ক্ষণে তাদের দেহ-মন পালটে যায়। মেয়েরা হল আকাশ।

মেজর মাঝে মাঝেই নিজেকে ধমকান, এখনও তুমি তার কথা কেন ভাবো! আর তখনই অনুভব করেন, তিনি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন রেবেকাকে। আর তখনই বুঝতে পারেন রেবেকা তাকে ভালোবাসেনি। সে এমন কিছু চেয়েছিল যা মেজর দিতে পারেননি। সেটা কী? হয়তো সঙ্গ! যাক গে। এত বড়ো পৃথিবী, কত লোকজন, পরিবার, হাসি-কান্না, উৎসব অন্ধকার! জীবন তো থেমে থাকার নয়! মেজর জোর গলায় অর্ডার দিলেন, 'কম্প্যানি ফরোয়ার্ড মার্চ!'

সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে নারীকণ্ঠ—লেফট্-রাইট, লেফট্-রাইট।

গান্ধারী ঘরে ঢুকে বললে, 'চলো, তোমার ডাক পড়েছে।'

বৈঠকখানায় বিরাট ব্যাপার। ফোটোগ্রাফার কুন্তল এসেছে। সবাইকে নিয়ে একটা গ্রুপ ফোটো তোলা হবে। মিত্তির বাড়ির অ্যালবামে থাকবে। নির্মল বলে, যখন 'রাইজ অ্যান্ড ফল অফ মিত্তির পরিবার' লেখা হবে তখন ছবিগুলো কাজে লাগবে।

মেজর এসে দেখলেন, কুন্তল ক্যামেরার স্ট্যান্ডটা একবার এদিক, একবার ওদিক করছে। স্মার্ট ছেলে। মিত্তিররা হই হই করে আহ্বান জানাল। 'মেজর, মেজর'।

কুন্তল একটু ফচকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'মেজরকে মাঝখানে রেখে মাইনররা যে যার জায়গা নিয়ে নিন। অ্যাডজাস্ট ইওরসেল্‌ভস। আমাদের নায়িকা কোথায় গেল? গ্রেট গান্ধারী!' গান্ধারী মেজরের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। সেইখান থেকে বললে, 'আমার দাঁড়বার জায়গা নেই ভাই।' মেজর তাকে টেনে সামনে আনলেন। এইবার আমরা নাটক দেখি।

ফোটোগ্রাফার : একটু সরে, বড়দা একটু ডানদিকে। উঁহু বাঁদিকে যাচ্ছেন কেন?

বড়দা : কার ডানদিক? আমার না তোমার? শোনো নির্দেশ যখন দেবে পরিষ্কার নির্দেশ হওয়া চাই। তোমার মাথায় এক, বলছ আর এক। তোমার বলা উচিত ছিল, আপনার ডানদিক।

মেজদা : শুরু হয়ে গেল। ওরে! মুখের কাছে একটা মাইক্রোফোন ধরে দে। আরো আধঘণ্টা উচিত-অনুচিতের লেকচার হোক।

বোন [কুসী] : আধঘণ্টা হয়ে গেল। ঝড়ের এঁটোপাতার মতো, একবার ডান থেকে বাঁ, বাঁ থেকে ডান।

বড়দা : আমার মনে হচ্ছে পাশাপাশি স্ট্রেট লাইনে দাঁড়ালে ভালো হতো।

মেজদা : তোমার মুন্ডু হতো। এত বড়ো একটা গ্রুপ। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘোড়ার ক্ষুরের নালের আকারে, কাস্তের আকারে...

বড়দা : তোর মতো একটা ইডিয়েটের আকারে...

মেজদা : তোমার মতো একটা পণ্ডিত মূর্খের নির্দেশে...

ফ্ল্যাশ ঃ আলো চমকে উঠল।

কুসী বললে, 'যাঃ! মেরে দিলে। হেসেছি কিনা মনে নেই।'

কুন্তল বললে, 'ছবি খুব পারফেক্ট হবে। যেমনটি চেয়েছিলুম, মিত্তির বাড়ির চনমনে গ্রুপ। একটাই ভয়, মেজর সাহেবের মাথাটা আসবে কি?'

কুসী বললে, 'সে কি? মানুষের পরিচয় তো মাথায় রে!'

'ডোন্ট ওয়ারি। সে রকম হলে মাথাটা তুলে নিয়ে কেটে বসিয়ে দোবো।'

মেজো বললে, 'কম্পিউটারের যুগ। সবই করা যায়, রামের মাথা শ্যামের ঘাড়ে। শ্যামের মাথা রামের ঘাড়ে।'

সবাই জায়গা মতো বসে পড়েছে। কুন্তল লটবহর গোটাচ্ছে। দুই মিত্তিরে আবার লাগল।

মেজো : বড়দা তুমি এখনও মিচকি হাসি হাসছ কেন?

বড়ো : অফ করতে ভুলে গেছি। ছবি তোলার সময় অন করেছিলুম। দেখবি, আলো আর হাসি, যে অন করে খুব হিসেবি না হলে অফ করতে ভুলে যায়। কুন্তল হঠাৎ তুমি ছবি তুললে কেন?

কুন্তল : লাস্ট ফিল্ম। এক্সপোজ করে দিলুম। এইবার রিলটা খুলে ওয়াশ করব।

মেজো : একেই বলে, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

বড়ো : এই কথাটা অপমানসূচক।

মেজো : কুন্তল আমার ছাত্র ছিল। ওকে একসময় আমি বাঁদর, উল্লুক, গাধা, থ্রি ইন ওয়ান বলেছি। আমার সে অধিকার আছে।

বড়ো : কুন্তল আমার পেশেন্ট। আত্মিক আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। নার্ভাস টেনশানে ভুগছে। ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম আসে না।

মেজো : কেন আসে না?

কুন্তল : ভয়ে।

মেজো : ভয়ের ওষুধ ঘুমের বড়ি নয়, সাহস। কারেজ। মেজরের মতো সাহসী হও।

কুন্তল : স্যার! ও ভয় আর এ ভয়ে অনেক তফাত। অন্যের ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে আমি ঘুমোতে পারি না।

মেজো : সে আবার কী!

কুন্তল : আজ্ঞে, আগে আমি ঘুমোতুম। আমার স্ত্রী সারারাত জেগে থাকত। চোখ গর্তে ঢুকে গেল। রোগা হয়ে গেল। হজমের গোলমাল। সবাই বললে, ফিমেল ডিজিজ। অনেক চিকিৎসা করালুম। শেষে জানা গেল ওটা মেল ডিজিজ।

মেজো : ফিমেলে মেল ডিজিজ কী ব্যাপার! ফি মেলে বলেই না ফিমেল ডিজিজ।

কুন্তল : স্যার! লজ্জার কথা বলব কী!

মেজো : আরে লজ্জার কী আছে, ডিজিজ বলছ কেন? ফিমেলে ফিমেল আসতে পারে মেলও আসতে পারে। মানুষের হাতে কিছু নেই। আর ছেলেপুলেদের ডিজিজ বলাটা ঠিক নয় কুন্তল। সব মানুষেই মহামানবের সম্ভাবনা।

ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

কুন্তল : স্যার মহামানব নয় মহা-নাক। শোয়া মাত্রই আমার নাকের পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে ওঠে। হরেক জানোয়ারের মিলিত ডাক। শোবার ঘরে আফ্রিকার অরণ্য। প্রতিবেশীদের কমপ্লেন। আপনার বউমা ভয়ে জানলা খোলে না।

মেজো : গাধা কোথাকার। ঘুমের ওষুধ বউকে খাওয়া, নিজে সুখে নিদ্রা যা।

কুন্তল : সেইটাই তো করছি। প্রেসক্রিপশান আমার নামে, ওষুধ খাচ্ছে মিসেস।

বড়দা : বাঃ, এই না হলে রুগি। এদের জন্যেই ডাক্তাররা পেটাই খায়।

মেজো : এক কাজ করো না দাদা, নাকটা খুলে ক্লিন করে আবার সেট করে দাও।

বড়ো : নাক নাকের জন্যে ডাকে না, প্রবলেমটা গলায়।

মেজ : তাহলে গলাটা কেটে দাও।

বড়ো : তারপর জেলে যাও, তারপর ফাঁসিতে লটকাও। আধহাত জিভ বের করে লাট খাও। আহা রে! আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ রে!

মেজো : এরা সব দাঁড়িয়ে কেন?

বড়ো : আমাদের শ্রুতিনাটক শোনার জন্যে।

মেজো : কর্তব্য কর্মে অবহেলা। আমাদের তো এখন টি-টাইম। [হাঁক] গান্ধারী!

গান্ধারী বললে, 'চায়ের সঙ্গে সামান্য কিছু আয়োজন আছে।'

নির্মল বললে, 'কি আয়োজন জানতে পারি!'

'গরম গরম পাকোড়া।'

'ফ্যানটাস্টিক! তাড়াতাড়ি হাজির করো।' নির্মলের আর তর সইছে না।

বিমল মেজরকে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে আপনার? এত গম্ভীর?'

'মাঝে মাঝে মনের যে কি হয়, ড্যাম্প লেগে যায়।'

'যা বলেছেন। আমারও ওই এক সমস্যা। বেশ আছে, হঠাৎ কি হল!'

'এ হল মনের স্বভাব।'

নির্মল বললে, 'সব সময় কাজে থাকলে মন মানুষের বাগে থাকে।'

মেজর বললেন, 'না রে ভাই! কাজের অভ্যাসে কাজ করি আমরা, তখন মনের দিকে তাকাই না। তাকালে দেখা যাবে বিষণ্ণতায় ভরা। এর কারণ, প্রতিদিনই আমরা একদিন করে মরে যাচ্ছি যে! মৃত্যুর উৎসবে বসে কত আর আনন্দ করা যায়! এই পৃথিবীর একটাই আসল কথা—'যায়'।

আজ যায়, কাল যায়, শৈশব যায়, যৌবন যায়, জীবন যায়।'

গান্ধারী ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'গরমাগরম পাকোড়া আসে।'

'তোর মন খারাপ হয়?' বিমল জিজ্ঞেস করলে।

'দিদি রাগ করলে হয়।'

'তখন কী করিস?'

'দিদির কাছে ফ্যাঁস ফাঁস করে কাঁদি।'

'দিদি রাগ করে কেন?'

'ওমা, এ কি! রাগ না করলে ভালোবাসা আসবে কী করে! গরম ঘিয়ে লুচি ছাড়লে তবেই না ফুলকো হবে! ঠাণ্ডা ঘিয়ে হয়? নাও তো! অনেক জ্ঞান হয়েছে!'

গান্ধারী গটগট করে চলে গেল। মেজর বললেন, 'এরাই আনন্দে আছে। হয় ভগবান, না হয় কোনো আদর্শ মানুষের কাছে বেঁচে থাকাটা ফেলে দিতে পারলে সব সমস্যার সমাধান। শ্রীরামকৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন, আমি খাই, দাই, আর থাকি আর সব আমার মা জানেন। দেখো, অনেক লড়াই-টড়াই করে জীবনের তলানিতে এসে সার বুঝেছি, পৃথিবীটা ভগবানের। কে তিনি বোঝার চেষ্টা করে কোনো হদিস পাওয়া যাবে না। বুঝলেও তিনি আছেন, না বুঝলেও তিনি আছেন।'

॥ ৪ ॥

ভদ্রলোক বাড়ির নেমপ্লেট দেখলেন। হাঁ করে দেখলেন বৃহৎ গেটটা। বয়স্ক মানুষ। সাজপোশাকে টিপ্ টপ। নিজের মনেই বললেন, ইয়েস দিস হাউস। বৈঠকখানা ঘরে প্রায় সবাই রয়েছে। দুর্গাপুজো এসে গেছে। প্রত্যেকবারই পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে মিত্তিররা একটা নাটক নামায়। পরিবারের সবাই

অভিনয় করে। এমন কি গান্ধারীও। বাইরের অভিনেতা মাত্র একজন। সে হল ফটোগ্রাফার কুন্তল। নাটক খুব জমে।

সেই নাটকের রিহার্সাল চলেছে। ভদ্রলোক ঢুকলেন। বিমল বললে, 'বসে পড়ুন বসে পড়ুন।'

তখন ভীষণ কাণ্ড চলেছে। নাটকের 'টাইট্‌ল-সং'-এ সুর চড়ানো হচ্ছে। মিউজিক ডিরেক্‌টার কমল। হারমোনিয়ামে বসে আছে। গানের বাণী সবাই মিলে লিখছে। প্রত্যেকে এক একটা লাইন দেবে।

বিমল বললে, 'নে, লেখ, অনেক ভাগ্য করে মাগো জন্মেছি এই দেশে।'

নির্মল বললে, 'কত মানুষ ঘুরে বেড়ায় কতরকম বেশে।'

কমল বললে, 'সেই দেশেতে সবাই মিলে আবার তুমি এলে।'

কুসী বললে, 'আমরা পরাই মালা সাজাই ডালা ওরে দেনা প্রদীপ জ্বেলে।'

নবাগত বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল। তুমি ভৈরবী চড়িয়ে দাও।'

'আমাদের অভিনয় যে রাত্তিরে!'

'তাহলে কেদারায় বসিয়ে দাও।'

'ফ্যানটাস্টিক! আপনি গান জানেন?'

'কি মনে হয়?'

'মনে তো তাই হয়।'

বিমল জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কে?'

ভদ্রলোক একটা সুদৃশ্য কার্ড এগিয়ে দিলেন।

॥ বিনোদবিহারী বোস॥

বি.বি.এন্টারপ্রাইজ

।। ওয়ার্লডস নাম্বার ওয়ান কিউরিও ডিলার ।।

অ্যাপয়েন্টেড বাই দি কুইন অফ ইংল্যান্ড

হেড অফিস, সেন্ট জেমস প্যালেস কোর্ট

ক্যালকাটা অফিস, ওয়ান রিজেন্ট গ্রোভ

কার্ডটা হাতে হাতে ঘুরে অবশেষে মেজরের হাতে।

বিমল বললে, 'আপনি তো বিরাট ব্যক্তি।'

'নট অ্যাট অল। ভবঘুরে লোক। পুরতত্ত্ব, ইতিহাস আমার বিষয়। পৃথিবী চষে বেড়াই। বিলেতে আমার নাম আছে। কিছু কেনার আগে মিউজিয়ামগুলো আমাকে ডেকে পাঠায়।'

'হঠাৎ আমাদের সন্ধান পেলেন কী করে?'

'আমার ঠাকুর্দা ওদেশে সলিসিটার ছিলেন। তাঁর ওল্ড রেকর্ডস ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক ডিড্স পেলুম।

পড়ে দেখলুম, ওয়ান টি. সি. মিটার এসেক্সে তিন একর জমির ওপর একটা বাংলো কিনছেন। গেলুম সেখানে। একটা, পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বাড়ি। খোঁজ খবর করে কেয়ারটেকারকে বের করলুম। তারা তিন পুরুষ ধরে বাড়িটা আগলাচ্ছে। সো অনেস্ট অ্যান্ড ডিউটি বাউন্ড। আমার কাছে দলিলের কপি দেখে, চাবি খুলে ভিতরে নিয়ে গেল। প্রচুর জিনিসপত্র অযত্নে পড়ে আছে। এটা-ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বহু মূল্যবান একটা জিনিস পেয়ে গেলুম। প্রায় চুরি করে নিয়ে এলুম ইন্ডিয়ায়। এক বছর ধরে গবেষণা করে যে-তথ্য পেলুম তাতে চমকে উঠতে হয়।'

কারো মুখে টুঁ-শব্দ নেই। রিহার্সাল মাথায় উঠল। গান্ধারীর মুখ দেখলে মনে হবে, সে এ জগতে নেই। ভদ্রলোক বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে ছোটো একটা ভেলভেটের কৌটো বের করলেন। সামনের সেন্টার টেবিলের উপর কৌটোটা রেখে যেই ঢাকনাটা খুললেন, একটা জ্যোতি ঠিকরে বেরলো। সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'এটা কী?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'হীরে! এ রেয়ার পিস অফ ডায়মন্ড। এর নাম 'রূপমতী'। নূরজাহানের আর্মলেটে ছিল। ঘুরতে ঘুরতে ওদেশে চলে গিয়েছিল। আমার মনে হয় টি. সি. মিটার এটা কোনোভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। হি ওয়াজ এ বিগম্যান। প্রিন্স দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর কারবার ছিল। টি. সি. মিটারের উত্তর পুরুষ আপনারা। হীরেটা আপনাদের দিতে এসেছি। এর অনেক দাম, প্রায় এক কোটি টাকা।'

ঘর এমন নিস্তব্ধ, একটা পিন পড়লে শোনা যাবে।

বিমল বললে, 'আপনি তো নিয়ে নিতে পারতেন! আমরা এ-সবের তো কিছুই জানি না।'

'আমি তো চোর নই ভাই। অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। আর একটা কথা, ওই প্রপার্টিটারও এখন অনেক দাম। ওটা সম্পর্কেও ভাবতে হবে তো! আমার সঙ্গে আপনাদের একজন চলুন। ওটার পজেসান নিয়ে নিন। আরো বহু মূল্যবান জিনিস বেরোবে।'

গান্ধারী ভাবে বিভোর হয়েছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার মনে হয় আপনি ভগবান। আমি কফি করে আনি।'

'তুমি কি ভগবানকে দেখেছে?'

'মানুষই ভগবান। এই যেমন আপনি!'

গান্ধারী বেরিয়ে গেল। সবাই হাঁ। কী কথাই বলে গেল মেয়েটা।

ডাক্তারের চেম্বার যে ছেলেটি খোলে, পাহারা দেয়, তার নাম মদন। মদন ঘরে এল।

মদন : একজন বলছে ডাক্তারবাবুর চামড়া ছাড়াবে।

বিমল : কার? আমার?

মদন : একবার চেম্বারে যাওনা! তিরিশজন। কেউ কাশছে, কেউ হাঁচছে। একজন ফিলাট। একজন বললে, তোমার ডাক্তারের ঘুম ভেঙেছে?

বিমল : আমি ডাক্তারি ছেড়ে দোবো। আগে লোকে দেবতার মতো সম্মান করত। এখন? এখন হাঙর ভেবে মারতে আসে। নিতুদাকে বলো, টেবিলে যন্ত্রপাতি সব সাজাতে।

মদন : সে তুমি আর বলবে কি! আমরা সেই ভাবেই তো ম্যানেজ দিলুম এতক্ষণ। প্রথমে বুক ব্যথার যন্ত্রটা টেবিলে শুইয়ে দিলুম। বুক দেখার আলোটা জ্বালিয়ে দিলুম। হাওয়া। কিছুক্ষণ পরে জলের গামলায় তোমার আঙুল ডোবাবার জল। দু ফোঁটা ওষুধ। কিছুক্ষণ পরে পাটকরা তোয়ালে। তোমার বসার চেয়ারে ফটফটি। টেবিলে ডাস্টার ঘুরিয়েই হাওয়া। কিছুক্ষণ পরে পেরেসার দেখার যন্ত্রটা। হাওয়া। কিছুক্ষণ পরে প্যাড, পেন। আর প্রত্যেকবারই মিষ্টি করে হেসে—আসছেন, এই আসছেন। কাশির রুগিদের লবঙ্গ ধরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, 'নাঃ, আমাকে এইবার উঠতেই হল। দিন-কাল সুবিধের নয়। ডাক্তাররা এখন টার্গেট। আর দিন কতক পরে দেখা যাবে রুগির চেয়ে ডাক্তার মরছে বেশি। মিঃ বোস আজকের দুপুরের খাওয়াটা আমরা একসঙ্গে খাই না!'

মিস্টার বোস বললেন, 'অনেক কথা তো হলই না। আমি বরং একটা দিন আপনাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাই।'

'ওঃ হো! গ্র্যান্ড আইডিয়া। একটা দিন কেন, আপনি ফর-এভার এখানে থাকুন। আর কত ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন?'

'মদের নেশার মতো ঘুরে বেড়ানোটাও একটা নেশা। কথা দিচ্ছি, মাঝে মাঝে আসব।'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি, আমাদের মেজর সাহেব। অনেক বড়ো

বড়ো যুদ্ধ করেছেন। কাশ্মীরে, বাংলাদেশে, ইন্দো-পাক, ইন্দো-চায়না।'

দু-জনে হাসতে হাসতে করমর্দন করলেন। বিমল চলে গেল চেম্বারে।

মিঃ বোস বললেন, 'এই মহামূল্য জিনিসটা তুলে রাখতে হবে।'

কুসী বললে, 'আপনার কাছেই থাক।'

'সে কি, তোমাদের জিনিস আমার কাছে থাকবে কেন? তুমি কে?'

মেজর বললেন, 'ওই তো এই পরিবারের অল-ইন-অল। মিত্তিরদের বোন। আমরা ডাকি কুসী।'

'বাঃ, বিউটিফুল নাম। আমিও কুসী বলব। কুসী তোমাদের চেস্টে তুলে রাখো। এক কোটি টাকা দাম। লন্ডনের অকশন হাউস সুথবিতে তুললে হয়তো আরো বেশি দাম হবে। এর পেছনে যে একটা ইতিহাস আছে।'

মেজর কুসীকে বললেন, 'মিঃ বোস সাহেব মানুষ, ওঁকে আমার দিকে নিয়ে যাই। ভালো লাগবে।' দুজনে বেরিয়ে যাওয়ার পর, কমল বললে, 'আমরা তো বিশ্রী রকমের বড়লোক হতে চলেছি। এ রকম হয়!'

'কেন হবে না! কৌন বনেগা ক্রোড়পতি।'

কমল হারমোনিয়ামে সুর তুলতে লাগল। নির্মল গুম মেরে গেছে। বড়লোক হওয়ার সম্ভাবনায় ঘাবড়ে গেছে। কমল কেদারায় ফিট করে গাইছে ঃ

অনেক ভাগ্য করে মাগো জন্মেছি এই দেশে,
কত মানুষ ঘুরে বেড়ায় কত রকম বেশে,
সেই দেশেতে সবাই মিলে আবার তুমি এলে,
(আমরা) পরাই মালা সাজাই ডালা (ওরে) দেনা প্রদীপ জ্বেলে।

বোধ হয় পূর্ণিমা। চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। শরতের চাঁদ। তার আলাদা শোভা! কাচের ঘরে সবাই সমবেত। কুসী বললে, 'সিন্দুকে হীরেটা ফেলে রেখে লাভ কি? আপনি বিক্রি করে দিন। আর এসেক্স-এর ওই প্রপার্টিটা বরং উদ্ধার করুন। মাঝে মাঝে আমরা সবাই ওখানে গিয়ে থাকব।'

মেজর বললেন, 'বিলেতে অত বড়ো একটা সম্পত্তি রাখার অনেক খরচ।'

'তাহলে ওটাকেও বিক্রি করে দিন।'

'করা শক্ত। মিস্টার মিটার মারা গেছেন। কোনো উইল করে যাননি। ওই সম্পত্তির কোনো উত্তরাধিকারী নেই। ওটা শেষে স্টেট-প্রপার্টিই হয়ে যাবে।'

নির্মল বললে, 'চেষ্টা করে দেখুন না।'

'সে আমি চেষ্টা করব। একটা এফিডেবিট করে আমাকে দিন যে আপনারা তাঁর উত্তর পুরুষ।'

কমল বললে, 'বিষয়ের কথা অনেক হল। বড়লোকও হয়ে গেছি। কয়েক কোটি টাকার মালিক। মিস্টার বোস এইবার আমরা গানে বসি, এমন চাঁদের আলোর রাত। বৃষ্টি ধোয়া, মেঘ ভাসা শরতের আকাশ।'

মেজর বললেন, 'একটা সম্পর্কে এলে কেমন হয়! 'মিস্টার বোস' শুনতে আর ভালো লাগছে না।'

বিমল বললে, 'আপনি আমাদের নতুনদা।'

'না, আমি শরৎচন্দ্রের নতুনদা হতে চাই না।'

মেজর বললেন, 'তাহলে আপনি আমাদের সকলের দাদা।'

'আঃ সে ভালো দাদা।'

'তাহলে দাদা একটা গান।'

'কমল! তুমি আগে একটু সুর লাগাও।'

দেখতে দেখতে তৈরি হল সুরের রাত। দাদা সকলকে অবাক করে দিয়ে গাইলেন, রবীন্দ্রনাথের গান,

আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই টান্ রে সবাই টান্।।
বোঝা যত বোঝাই করি করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের পরে ধরব পাড়ি—যায় যদি যাক প্রাণ।।

'আপনি তো ভীষণ ভালো গান করেন!'

'একসময় আমাদের বাড়িতে খুব গানের চর্চা হতো। তারপর উত্তপ্ত-সুখ ঢুকে শান্ত-সুখকে তাড়িয়ে দিলে। উত্তপ্ত সুখ হল, অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তি, শান্ত-সুখ হল সংগীত, ঈশ্বর-চিন্তা। মানুষ জ্বলে-পুড়ে বড়ো সুখ পায়। এই আমার ধারণা। এসেক্সে আমার বাড়িতে একটি শিব মন্দির করেছি। প্রতিষ্ঠা করেছি ছ-ফুট উঁচু শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ। বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরি—আঃ, কি শীতল কি শান্তি, কি সুগন্ধ, কি নিস্তব্ধ সংগীত।' দাদা গান ধরে ফেললেন।

শংকর শিব ভোলানাথ মহেশ্বর।
মহাদেব দেব গঙ্গাধর হর।।
পিনাকধারী পরম ভিখারী
শ্মশানচারী শম্ভু শুভংকর।।

এক একবার এমন সুর লাগছে কাচের শার্সিও সুরের ঝংকার দিয়ে উঠছে।

বাইরে চাঁদের আলোর প্লাবন। ভিতরে সবাই পাথর। কমল, কুসী নিয়মিত সংগীত চর্চা করে। ইমন রাগের অপূর্ব বিস্তার দেখে তাদের চোখে জল এসে গেছে। ঘরের চারটে দেয়ালই প্লেট গ্লাস দিয়ে তৈরি। ঝকঝকে কাচ। বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বকুলের বেদি। দেবদারু, পাইন, পাম, পথ চলে গেছে ঘুরে, ঘুরে। মেজর হঠাৎ ফিস ফিস করে বললেন, 'ওকি?'

সবাই দেখল, পরনে বাঘ ছাল, হাতে ত্রিশূল, দুধের মতো রং, বিরাটকায় এক পুরুষ বাইরে পায়চারি করছেন। মাথায় পিঙ্গল জটাজাল। গান্ধারী অবাক হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন সকলেই গাইছে—শংকর শিব ভোলানাথ মহেশ্বর।

মেজর বলছেন, 'থামবেন না, তাহলে ওই রূপ অদৃশ্য হবে।'

দাদা ইমন থেকে মালকোশে চলে গেছেন। মাঝরাতের রাগ,

যোগীশ্বর ঈশ্বর বিভূতিভূষণ,
নমো নমো আশুতোষ মানস-মোহন

সকলেরই মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। এমন গান তো কখনও কেউ শোনেনি। সুর যেন থই থই করছে। চাঁদ অনেকটা পশ্চিমে নেমে এসেছে। পশ্চিমের কাচে সোজা এসে পড়ছে রুপোলি বিচ্ছুরণ।

পরিরা হয়তো এখুনি নেমে আসবে ছোটো ওই সুইমিং পুলে। কাল ভোরে যেখানে অনেক পদ্ম ফুটবে। শিশিরের কাল যে এসে গেছে। হঠাৎ বাইরেটা সাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সেখানে বাতাসের ঘুরপাক। সাপের মতো। সে কি নৃত্য! মনে হচ্ছে মহাদেবের মুক্ত জটাজালে সাপ ঘুরছে কিলবিল করে।

হঠাৎ গান থেমে গেল। মিস্টার বোসের মুখে অদ্ভুত হাসি থমকে আছে। সারা ঘর ভরে গেছে পদ্মের গন্ধে। শেষ চাঁদের আলোয় ঘরের ভিতরটা যেন বরফের টুকরো। মিস্টার বোস পাথর হয়ে গেছেন। তিনি চলে গেছেন। বাইরের রহস্যময় কুয়াশা অদৃশ্য। দিনের ঘুম ভাঙছে। মিস্টার বোসের দেহে প্রাণ নেই। তাঁর কোলের উপর সেই হীরেটা জ্বলজ্বল করছে। হীরের মতো মানুষটি হীরেটি রেখে চলে গেলেন। অদ্ভুত!

মিত্তির বাড়ি কয়েক দিন থম মেরে রইল। সরকার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে মিস্টার বোসকে বাগানেই সমাহিত করা হল। কলকাতার ঠিকানায় গিয়ে দেখা গেল সুদৃশ্য একটি ফ্ল্যাট। দোতলায়। বাইরে নেম-প্লেট। কিন্তু দরজা

তালা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। কেয়ারটেকারস্ অফিসে গিয়ে জানা গেল, বেশিরভাগ সময় বিলেতেই থাকেন। মাঝে-মধ্যে আসেন। একেবারে একা। লন্ডনে জানানো হল। ডেথ সার্টিফিকেটের কপি পাঠান হল। মিত্তির বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হল।

দিন-দশেক পরে এক বিদেশিনি এলেন। বেশি বয়েস নয়। খুব কাঁদলেন। সমাধির উপর পদ্মফুল সাজিয়ে দিলেন। জানা গেল মিস্টার বোস একজন নামকরা আর্কিওলজিস্ট। সাধক। অকাল্টিস্ট। মেয়েটি তাঁর পালিতা কন্যা। আর্কিওলজির ছাত্রী। মেয়েটির নাম ক্লারা। সে মিত্তির বাড়ির প্রেমে পড়ে গেল। কুসীকে তার ভীষণ পছন্দ। বড়ো মিত্তিরকেও। কুসী হল দিদি। বিমল হল দাদা। কিন্তু সে এসেছে মাত্র একমাসের ভিসা নিয়ে। যাবার সময় বলে গেল আপনাদের বিলেতের সম্পত্তি আমি উদ্ধার করে দোবো, আর আমাদের বাড়িটা তো আছেই। কুসীকে বললে, 'দিদি, আমার কেউ নেই, তোমাকে আমার নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।' কুসীকে বহুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রইল। কুসী সাতদিনে পরার জন্যে সাতখানা শাড়ি দিয়েছে। গলার হার দিয়েছে সোনার।

মেজরও চলে গেলেন ক্লারার সঙ্গে। বিলেতে তাঁর মেয়ে থাকে। আর কদিন পরেই পুজো। বাইরের ঘরে রিহার্সাল চলেছে পুরোদমে। কমল হঠাৎ বললে, 'অসম্ভব। এবারে আমাদের নাটক বন্ধ করে দাও। আমার কান্না আসছে। মিস্টার বোসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রিহার্সালের প্রথম দিনেই তিনি এসেছিলেন।'

বড়ো মিত্তির বললে, 'আমারও সেই এক অবস্থা। তিনি মনে ঢুকে গেছেন।'

একে একে সবাই একই কথা বললে।

কুসী বললে, 'আমাদের একদম পালটে দিয়ে গেছেন। আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। মিত্তিরবাড়ি এখন মহাতীর্থ। শিবক্ষেত্র।'

কমল মালকোশে সেই অলৌকিক রাতের গানটিই ধরল, 'শঙ্কর শিব ভোলা নাচে নাচে রে।'

॥ ৫ ॥

মিত্তির বাড়িতে হঠাৎ যেন একটা পরিবর্তন এসে গেল। অকারণ হইচই, অকারণ গাল-গল্প কমে গেল। সবাই সিরিয়াস। মেজো মিত্তির চিরকালই একটু অন্যরকম। অধ্যাপক মানুষ। প্রচুর লেখা-পড়া করতে হয়। বড়ো মিত্তিরই ছিল সবচেয়ে আমুদে। তার পরিবর্তনটাই চোখে পড়ার মতো। আজকাল

অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে আলো জ্বলে। কুসী একদিন দেখল, বড়দা শেষ রাতে ধীর পায়ে কাচের ঘরের দিক থেকে আসছে। গভীর ভাবে মগ্ন। কুসী তাড়াতাড়ি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল। বাগানের ওই দিকটায় দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে।

কুসী সেদিন ডাক্তারের আর একটি লেখা আবিষ্কার করল। একটা বড় প্যাডে লিখেছে। লেখাটা কাচের ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়ে ফেলল।

* * *

'মেঘ নিয়ে, জল নিয়ে, পাতা নিয়ে, রোদ নিয়ে, পাখি নিয়ে, পাখির ডাক নিয়ে, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত নিয়ে মধ্যযুগীয় আদিখ্যেতার কাল শেষ হয়ে গেছে। আকাশ আকাশে আছে। সেখানে দিবসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মার্তণ্ডদেব প্রখর দীপ্তিতে সব গ্রাস করে থাকেন। তাঁর ব্রেকফাস্ট হল হাফ বয়েলড চন্দ্র। লাঞ্চ হল গ্রহ নক্ষত্র। ডিনার হল অন্ধকার। রাতের আকাশ বাগানে তারাদের ফুল ফোটে, ফসল ফলে, ধূমকেতু ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে, ছায়াপথ যেন সেচের খাল, কোনো এক দুষ্টু ছেলে মাঝে মাঝে উল্কার পাথর ছুঁড়ে তারা পাড়তে যায়। শুকতারা ডাগর চোখে ভোরের আকাশে জেগে থাকে সূর্যসম্রাটের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে নদীরা সব জেগে ওঠে। হিমকুট সেজে ওঠে সোনার মুকুটে। সম্রাটের আসনের চারপাশে প্রজাপতি-বালিকারা নাচ দেখাতে আসে। পেঁচা কোটরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, রাবিশ! বাদুড় ঝুলে পড়ে নতমুখী সাধনায়। কিরণ প্লাবিত আকাশ দেখব না। হেঁটমুন্ডে আঁধারের প্রতীক্ষা।

আকাশ আকাশে আছে, ভূমিতে আছে প্রজা। কোটি জঠরের ক্ষুধা নিবারণে ধরিত্রী উচ্চ উর্বরা। নদী সেখানে কবিতা নয়, সেচের বাহু, তৃষ্ণার জল, অকৃপন আকাশ বর্ষণে বন্যার বিভীষিকা। বৃক্ষ সেখানে ছায়া নয়, জনপদের শত্রু। ইন্ধন অথবা ইমারতের আসবাব। পাখির জন্যে প্রস্তুত শত খাঁচা, ব্যাধের গুলি। মুরগি মানেই রোস্ট। দুম্বা মানেই রেজালা।

ছাগলকে বললুম, কি সুন্দর সবুজপাতা।

ছাগল আধবোজা চোখে হুঁ হুঁ শব্দ করে বললে, ভেরি টেস্টফুল! মশ-মশ করে চিবোতে লাগল।

নিমেষে পত্রশূন্য কাণ্ড।

বাঘকে বললুম, কী সুন্দর হরিণ!

বাঘ উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোথায়, কোথায়! একটু দাঁত বসিয়ে টেস্ট করে আসি। সে কী যুবতী? একটু আগে বৃদ্ধ একটি বলদ সেবা করে

তেমন স্বাদ পেলুম না।

ইঁদুরকে বললুম, দেখেছ জ্ঞানেশ্বরী গীতা। অপূর্ব স্বাদ!

ইঁদুর বললে, কী ভাবে খেলে! আমি কাল রাতে একবার চেষ্টা করেছিলুম। মলাট দুটো বড়ো শক্ত। দেখি দাঁতে শান দিয়ে আসি।

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।

আমাদের ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, সৎ, অসৎ, দয়া, হিংসা, রৌদ্র ছায়ার এই পৃথিবী। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা অতি সুন্দর। তিনি বলছেন, "তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধহয়—ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? নাঃ ওজন করতে হলে খোলা বিচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এত ওজনের ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধহয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বেশি হয়, যে সত্ত্বাতে শাঁস, সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বিচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

"অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।"

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভালো-মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।"

বাজারে ভীষণ গন্ডগোল। মাছ বিক্রেতার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বিষম কলহ। আমরা শ্রোতা। কাটাপোনা সাতশো ওজন করিয়েছেন। বলেছেন আঁশ ছাড়াও। ফের ওজন করো। ছ'শোগ্রাম। ভদ্রলোক ছ'শোর দাম দেবেন। আমি মাছের দাম দেব, আঁশের দাম দেব কেন? কিছুতেই বুঝছেন না, মাছ মানে, মাছ আর তার আঁশ। সম্পূর্ণ একটি ব্যবস্থা। মাছ নিলে মাছের আঁশ, আঁশটে

গন্ধ সবই নিতে হবে।

জগৎকারিণী শক্তির নানাভাবে, নানাদিকে প্রকাশ। চণ্ডীতে দেবতারা সেই শক্তির স্তব করছেন, অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ। বিদ্যারূপে তিনি অতি সৌম্যা, অবিদ্যারূপে অতিরৌদ্রা। আগমশাস্ত্রে তিনি বিষ্ণুমায়া। বরাহপুরাণমতে এই বিষ্ণুমায়া মেঘ, বৃষ্টি ও শস্যের উৎপত্তির কারণ। জীবের চেতনা তিনি। তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ছায়া, শক্তি, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতা। তিনি প্রান্তিক। তিনি সবকিছু।

বর্তমানকালে অবিদ্যা মায়ার খেলা চলেছে। একটা কুয়াশা নেমেছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। পথ হারিয়েছে। পৃথিবী হেলে গেছে। একটা কথাই বড়ো হয়েছে ধান্দা। কি চাই জানি না। মারছি গুঁতো, মারছে গুঁতো। এই গুঁতোগুঁতিতে অবশেষে মাথায় না শিং গজিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাকে তাকে ঘিরে ফেললে, যেদিকে চিল মাছ মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পিছনে পিছনে কা কা করতে করতে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না।"

একালের মানুষকে একটি শিক্ষাই দেওয়া হয়, ভোগ করো। তুমি ভোগ করার জন্যেই এসেছ। তোমার দুটো পা। একটা ভোগ আর একটা দুর্ভোগ। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে করবে। খেল খতম, পয়সা হজম। যে শিক্ষা তোমাকে পয়সা উপার্জনের পথ বাতলাতে পারবে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। বাড়ি, গাড়ি, লকারে সম্পদ, ক্ষমতার চেয়ার, তারপরে না হয় ছাতে উঠে একবার বললে, আহা! এমন চাঁদের আলো/মরি যদি সেও ভালো। অর্থাৎ তুমি চাঁদের আলোয় অভিভূত হওয়ার সঙ্গতি অর্জন করেছ। বেকার হাঁ করে আকাশ দেখছে কোলে পড়ে আছেন জীবনানন্দ। কবিতার এক একটি লাইনে পুলকিত শিহরণ ঃ

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে।
হরিণেরা; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;

বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা—না, বউদি ঝাড়িছে শাড়ি, কর্কশ কণ্ঠ। হরিণের গাত্র চিত্রিত; কিন্তু বহুশাখ শৃঙ্গ অতিশয় কঠিন। 'এই যে, দাদার হোটেলে টেরি বাগিয়ে বসে আছো, একটু গতর নাড়িয়ে যাও না, গ্যাসটা লিখিয়ে এসো। একটা মানুষ কতদিক একা সামলাবে! দয়া, মায়া, লজ্জা, সব গেছে নাকি!' দুম, দুম।

আকাশের মতো উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল—বেকার যুবক সাকার দাদার সহধর্মিনীর দিকে। তাঁর হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকিতে গৃহ উত্তাল। তিরিশটি ইন্টারভিউতে ব্যর্থ বীর বোঝে না, ভবিষ্যৎ কোথায় ঃ

ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজও মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে!

ঝাং। বাসন পড়ার শব্দ। কাজের মহিলার সঙ্গে প্রভাতী সংকীর্তন। কাটা ঢেঁড়স, ফালা বেগুন, রংমাখা পটলসুন্দরী, চিৎপাত একটি মাছের মৃতদেহ, খবরের কাগজ-মুখে আড় হয়ে শুয়ে থাকা গৃহের সাকার কর্তা। রুক্ষ্ম চুল, শালোয়ার কামিজ পরা তরতরিয়ে বেড়ে ওঠা বোন, যার আর এক পরিচয় চলমান দুশ্চিন্তা, দেয়ালে ঝুলে থাকা পরিবারের নাটের গুরু পিতার ধূসর চিত্র। তারই তলায় জুলজুলে দাদা-বউদির ছবি—মুসুরির পাহাড়ে বিয়ের পর তোলা। সে চেহারা আর এ চেহারায় মিল নেই। ক্ষয়ে যাওয়া নায়িকা এখন তিতিবিরক্ত ধূমাবতী। নায়ক মধ্যভাগ সর্বস্ব একটা পুঁটলি। নবাগত শিশুটি শৈশব হারানো ভীত এক মনুষ্যশাবক মাত্র। তেল যত পুড়ছে খেলা তত জমছে না।

গোটা পৃথিবী কেমন যেন ভ্যাবাচেকা মেরে গেছে। আকাশ ভয়ে আর মুখ খোলে না, মেঘের আঁচল টেনে রাখে। মাঝে মধ্যে আঁচল সরিয়ে রোদ যখন তীর মারে, বড়ো তীক্ষ্ণ, কর্কশ। ধুলো, আর ধোঁয়ায় সবুজপাতা মরোমরো। ফুল ফোটে কোনোরকমে, সুবাস হারা। মানুষের সংগ্রাম চলেছে অসংখ্যের জীবনধারনের জড়াজড়ির সঙ্গে। সুর ভুলে সব অসুর। দেবতাদের যুগ শেষ। স্নেহ এখন তৈলে। মানুষের অদৃশ্য নিরাকার মনে জোড়া জোড়া বিষাক্ত হুল। বাক্যের দংশনে বিষাক্ত তরল, বল্লমের খোঁচা। পায়ে পা রেখে

তুমুল ঝগড়া। সন্দেহ, ঘৃণা। বাপ বললে, শালা! সূক্ষ্ম নির্যাতন। একদল মৃত-মন নরনারীর উপর দিয়ে অট্টহেসে মহাকাল চলেছে। পিঠে তার শূন্যঝুলি। 'কী দিলে তোমরা জীবনের উপহার!' বীর কোথায়, কোথায় প্রেমিক, জ্ঞানী কোথায়, কোথায় তোমাদের শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদেশিনি নিবেদিতা!

মহাকাল ঘণ্টা বাজায়, আমরা বসে বসে বানাই ছ্যাঁচড়া। ভাবি এইটাই জীবন। নদী নদীতেই আছে, হৃদয়ে যমুনা হয়ে আসে না। যন্ত্রের ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কানে আর আসে না। বিশ্বাসের বিশাল শবদেহের উপর বসে জীবনের বনভোজন। নীল নিদ্রায় খুলে যায় না স্বপ্নের সোনার জগৎ। কেউ কি আর প্রার্থনা করে ঃ

বরিষধারা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী।।

তবে সংস্কার কী সহজে মরবে! সংস্কারে আছেন কমলাকান্ত ঃ

যখন যেরূপে মাগো রাখিবে আমারে সেই সুমঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।
বিভূতিভূষণ কিংবা রতন মণি-কাঞ্চন, তরুতলে বাস কিংবা রাজসিংহাসন
সম্পদে বিপদে অরণ্যে বা জন-পদে মান-অপমানে কিংবা রিপুকারাগারে।।

আমি ডাক্তারি করি। কতরকমের পরিবারের একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকতে হয়। বড়লোকদের জন্যে বড়ো বড়ো ডাক্তার নার্সিংহোম। আমি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের ডাক্তার। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, এরা আর থাকবে না। তখন আমিও থাকব না। এরপর ডাক্তার ডাকার, ওষুধ কেনার পয়সা থাকবে না। পথ্য তো দূরের কথা। কুকুর, বেড়ালের মতো মানুষ মরবে। কেউ দেখার নেই। ধাপ্পা দিয়ে আর কতকাল চালানো যাবে। ক্রোধ জমছে। ক্রোধের উত্তাপ আণবিক উত্তাপের চেয়ে প্রবল। ঘূর্ণীঝড়ে, সাইক্লোনে সব যেমন মড় মড় করে ভাঙে, ঠিক সেইরকম একদিন সব দুমড়ে মুচড়ে যাবে। নটরাজের নৃত্য। পিনাকে বাজে টংকার। ফরাসি বিপ্লবের মতো একটা বিপ্লব হলে কেমন হয়! সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। আবার, আবার। একটা চাকা। শনিকে ঘিরে আছে রহস্যময় বলয়, রিং। কাল রাতে কনফুসিয়াস পড়তে পড়তে এইটা পেলুম,

In a country well governed, Poverty is something
to be ashamed of,
In a country badly governed,
Wealth is something to be ashamed of.

এইবার বিশ্বের দিকে তাকাই, সুশাসিত দেশ থেকে দারিদ্র্য লজ্জায় পালিয়েছে আমাদের এই দুঃশাসিত দেশে কলঙ্কের মতো একটি গোষ্ঠি সব সম্পদ ভোগ করছে। অপেক্ষা করা যাক। দেখা যাক কী হয়!

কুসী সবটা পড়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ওই রাতে খাবার ঘরে বড়ো মিত্তির বললে, 'পর পর কদিন আমি ত্রিনয়ন দেখছি।'

একে, একে সকলেই বললে, তারাও দেখছে। কেন দেখছে জানে না।

বড়ো মিত্তির প্রশ্ন করলে, 'কোন দেবী তাঁর চোখের জন্যে বিখ্যাত!'

সবাই একবাক্যে বললে, 'মা দুর্গা।'

'চোখের দেবী মা দুর্গা। আমরা দুর্গাপুজো করব। আর মায়ের তৃতীয় নয়নে থাকবে ওই হীরেটা। বিসর্জনের সময় খুলে নেওয়া হবে। কি রে কুসী! পারবি তো!'

সবাই বললে, 'নিশ্চয় পারব। মহাদেব এসেছেন। মা আসবেন না!'

অনেক রাত হল। কুসীর ঘুম আসছে না। খোলা জানলায় উদার আকাশ। সমুদ্রের মতো। জাহাজের মতো ভেসে যাচ্ছে এক এক খণ্ড মেঘ। তারাদের আলো ধরে। চোখ! আরও দুটি চোখ। কোন আকাশে তাকিয়ে আছে? সমুদ্র তুমি এখন কোন তটে অবিরাম ভেঙে ভেঙে পড়ছ?

তিন

আমার শ্বশুরমহাশয়ের সহিত গল্প করিতে করিতে আর একটি উষ্ণ কচুরি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। জামাতা বাবাজীবনের পরিতোষ বিধানের জন্য দীর্ঘদিন পরে শ্বশ্রূমাতা শরীরের যাবতীয় ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া সাতসকালেই পাকশালায় প্রবেশ করিয়া এমন সব পদপ্রকাশ করিতেছেন যাহাতে প্রাণ সম্পর্কে আমার আর সামান্যতমও মমতা নাই। 'এমনি চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল'—রূপান্তরিত হইয়াছে এমন অপূর্ব হিং-এর কচুরি যটা পারি খেয়ে মরি।

অদূরে একটি আরাম কেদারায় শ্বশুরমহাশয় ড্রেসিংগাউন পরিয়া মধ্যযুগীয় মহাপুরুষের মতো বসিয়া আছেন। চতুষ্পার্শ্বে চ্যুত বৃক্ষপত্রের মতো সংবাদপত্রের স্খলিত অংশ পাখার বাতাসে পক্ষবিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কোনোটিকে শ্রীচরণে, কোনোটিকে গুরু নিতম্বে চাপিয়া স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিতেছেন। ওষ্ঠদেশে একটি পাইপ ঝুলিতেছে। অবশ্যই নির্বাপিত ; কারণ আমি দেখিয়াছি, ওই বিলাতি বস্তুটি মানুষকে ধূম্রপান হইতে বিরত রাখিবার জন্যই সাহেবরা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অগ্নিসংযোগে ওই ওষ্ঠচুল্লিটিকে ধরাইবার চেয়ে একটি রন্ধন চুল্লি ধরান অনেক সহজ কার্য। সেই কারণেই উহা বয়স্কদের জন্য কাষ্ঠনির্মিত এক ধরনের মহার্ঘ চুচুক ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্বশুরমহাশয় সারা দিবসই ওইটিকে আগলাইয়া থাকেন। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের উচ্চপদে অভিষিক্ত ছিলেন। দুর্দান্ত যৌবনে বৃক্ষ আর ব্যাঘ্র, এই ছিল তাঁর সঙ্গী। হাজার হাজার কুক্কুট তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছে। কারণ তিনি মনে করিতেন পুরুষের মতো পুরুষ অর্থাৎ যাহারা নরশার্দূল তাহারা প্রোটিনভুক হইবে। অস্থি ও পেশি এই দুটিই তাহাদের সম্বল। কুক্কুট মাংস জঠরে প্রবেশ করিয়া দুই ভাগে বিভাজিত হইবে, ক্যালসিয়াম দেহস্থ অস্থিসমূহকে বংশের ন্যায় পুষ্ট করিয়া কাঠামোটিকে সবল করিবে আর অ্যামিনো অ্যাসিড পেশি নির্মাণ করিয়া তাহার উপর বসাইবে আর ব্রেন নামক সম্পদটি বর্ধিত হইবে। পুঁইশাক, কুমড়া, কচু, ঘেঁচু সৃষ্টি আবর্জনা বিশেষ। গবাদি পশুরা গ্রহণ করুক, দুগ্ধ করিয়া মানবজাতির সেবা করুক। নারীরা মৎস্যের মুণ্ডসহ ছ্যাঁচড়া প্রস্তুত করিয়া গ্রহণ করিলে আপত্তি নাই। কারণ

তাহাদের মেটাবলিক পাওয়ার জোরদার। তাহারা ইচ্ছা করিলে সজিনা ও ডেঙ্গোডাঁটা চিবাইতে পারে, কারণ তাহারা একটা লইয়া যত ব্যস্ত থাকিবে পুরুষের পক্ষে ততই মঙ্গলের। তাহারা কিঞ্চিৎ শান্তিতে নিজ কার্যে নিরত থাকিতে পারিবে। হিসাব অতি সহজ—উহাদের দিক হইতে যতগুলি মুরগি বাঁচিবে, ততগুলি এই দিকে তন্দুরি হইবে। নারীগণ কোমল হইবেন, তাঁহাদের মসৃণ ত্বক হইবে, দেহ লালিত্যপূর্ণ হইবে, সুতরাং তাঁহাদের আহার্যে ঘাস-পাতার পরিমাণই অধিক হওয়া উচিত। তাঁহারা পেশি বাগাইয়া লম্ফঝম্প করিলে পুরুষরা তাহাদের প্রেমে আর পাগল হইবে না। এই মতে তিনি আজও অবিচল। সেই কারণে কচুরি স্পর্শ করেন নাই। দুইটি বৃহদাকার মর্তমান কলা, একটি অখণ্ড পাউরুটি ও এক গেলাস দুগ্ধ দিয়া সকাল শুরু করিয়াছেন। কালো কফি পছন্দ করেন বলিয়া, এক ফ্লাস্ক কালো কফি পার্শ্বেই মজুত রহিয়াছে। বিশ্ব-পরিস্থিতি যত অশান্ত হইতেছে, তাঁহার কফি সেবনের মাত্রাও তত বাড়িতেছে। মমতার কি হইবে ভাবিয়া এই মুহূর্তে অতিশয় উত্তেজিত। বীরাঙ্গণা আবার আন্দোলনে ঝাঁপাইতে চলিয়াছে, পাসোয়ানকে কেন্দ্র করিয়া সি বি আই-এর সহিত রাজ্য সরকারের ধুন্ধুমার বাঁধিবে, প্রধানমন্ত্রীর পঁচাত্তর হইল, ইউ পি-তে মায়াবতী কি-ই বা করিতে পারিবেন, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশি পুঁজি ক্যাপচার করিতে পারিবেন কি না, অর্জুন বলিতেছেন, কেন্দ্র ইচ্ছা করিয়া রাজিব-হত্যা মমলা পিছাইতেছে—সব মিলাইয়া পরিস্থিতি অতিশয় জটিল, অতএব তিনি ফ্লাস্কের দিকে হাত বাড়াইতেছেন। একটি কথাই বারে বারে বলিতেছেন, যাহার যাহাই হউক মমতার মস্তকে আবার ডাণ্ডা মারিলে কি হইবে! চৌচির হইয়া যাইবে, যাহাকে বলে ফুটি ফাটা। কাহারও মস্তক লইয়া এমতো দস্যুতা সভ্য-সমাজে বরদাস্ত করা যায় না। যৌবন থাকিলে দোনলা লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। যে বাঘ মারিয়াছে সে গোটাকতক দুষ্ট মানুষকেও মারিতে পারিবে। উত্তেজনার আধিক্যে পাইপের ডাঁটি কামড়াইয়া ধরিয়াছেন।

আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা। পিতার উত্তেজনা দেখিয়া স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, ব্লাডপ্রেসারের ঔষধ সেবন করান হইয়াছে কি না!

আমার এই জ্যেষ্ঠ শ্যালিকার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে। অধ্যাপিকা মনস্তত্ত্ব তাঁহার বিষয়। উজ্জ্বল ছাত্রী ছিলেন। অধ্যাপনায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তিনবার বিলাত গিয়াছেন ; কিন্তু কোনও অহঙ্কার

নাই। জোরে কথা বলেন, স্পষ্ট কথা বলেন। ন্যাকামি সহ্য করিতে পারেন না। শ্বশুরমহাশয়ের প্রথম সন্তান সেই কারণে তাঁহার গুণাবলী সমস্তই পাইয়াছেন। তেজস্বিনী। হুঙ্কার ছাড়িলে সমস্ত হনুমানই পালাইবে। বস্তুত তাহাই হইয়াছিল, যে-কারণে তাঁহার বিবাহ করা হইল না। ছাত্রীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক রোমিও প্রেম নিবেদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তিনজনকে কয়েকদিন চিকিৎসালয়ের শয্যায় শুইয়া থাকিতে হইয়াছিল, একজনকে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল। ইহার পর আর কেহ সাহস করে নাই। প্রকৃত পুরুষ তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার বিচারে তাঁহার পিতাই আদর্শ-পুরুষ। বাকি সকলে হয় উন্মাদ, না হয় অর্ধোন্মাদ। যৌন বিকারগ্রস্ত, ব্যাভিচারী। ইহাদের জীবন একটি সুড়ঙ্গের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। কেহই উন্মুক্ত প্রান্তরের পথিক নহেন। ইহাদের দৃষ্টিতে নারী ভোগের সামগ্রী। জীবনের উদ্দেশ্য—আহার, নিদ্রা, মৈথুন। শয়তানদের খপ্পরে একবার পড়িলে আখের মতো চিবাইয়া ছিবড়া করিয়া দিবে। পুরুষ তাঁহার করুণার পাত্র।

আমাকে তিনি কোন্ কারণে স্নেহ করেন আমার বলিবার সাধ্য নাই ; কারণ আমি মনস্তত্ত্ব বুঝি না, উদরের তত্ত্ব কিঞ্চিৎ বুঝি। ভগবান জিহ্বা দিয়াছেন কেবলমাত্র শব্দ উচ্চারণের জন্য নহে, তাহা হইলে স্বাদ দিবেন কেন। স্বাদু বস্তুসকল গ্রহণ করিতে হইবে, পরিপাক করিতে হইবে, তাহার পর আবার গ্রহণ করিতে হইবে। স্বল্প আয়ু, বহু খাদ্য, বহুশ্চ বিঘ্না, অতএব জীবের নহে, জিভের নষ্ট করিবার মত সময় নাই। একাগ্র আন্তরিকতায় আহারে মনোনিবেশ করাই জীবের কর্তব্য।

বিবাহের রাত্রেই বাসরঘরে তিনি আমার নাম রাখিলেন মহিষাসুর। তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ তো হইই নাই বরং অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। ইহার পর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, ফুলঝুরি জাতিতে বাজি হইলেও যেমন নিরাপদ, সেইরূপ তুমি জাতিতে পুরুষ হইলেও নারীদের পক্ষে নিরাপদ। তোমার সহিত নিভৃতে সময় কাটান যায় নির্ভয়ে। এই প্রকার চরিত্র-পত্র পাইয়া আমি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। সেই দিন আমি অনুভব করিয়াছিলাম, প্রকৃতই আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। যাহারা উদরাময়ে ঘন ঘন আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহারাই অতিশয় কামুক হয়—একথা আমাকে বলিয়াছিলেন আমার শ্বশুরমহাশয়। জানি না, কোন দর্শন হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে

আসিয়াছিলেন! বলিয়াছিলেন, ডিসপেপসিয়ার সহিত ডিমেনসিয়ার যোগ আছে। সেকস একপ্রকার ডিমেনসিয়া। তাঁহার মতো পদমর্যাদাসম্পন্ন, সচ্ছল পিতা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাটির সহিত কেন আমার বিবাহ দিলেন, সে সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যটি স্মরণীয়—যাহারা বলশালী, স্বাস্থ্যবান, হাঁউ হাঁউ করিয়া খাইতে ভালবাসে, তাহাদের মগজ কম হইলেও মানুষ হিসাবে সৎ ও সংযমী।

জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা মনোযোগ সহকারে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পাঠ করিতেছিলেন, একমাত্র তিনিই সর্বাগ্রে সম্পাদকীয় পাঠ করেন। ইহার চেয়ে কষ্টসাধ্য আর কিছুই নাই। একশত বুক ডন, দুই শত বৈঠক দেওয়া ইহার চেয়ে সহজ কর্ম। তিনি শুধু পাঠ করেন না, শক্তিশালী হইলে পাঠ করিয়া সকলকে শুনান, দুর্বল হইলে ঘন ঘন আক্ষেপ করিতে থাকেন, যেন পুত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠ শ্যালিকাকে আমি বড়দি বলি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'মহিষাসুর কটা কচুরি নামালে?' কী উত্তর দিব! আমি তো গণনা করি নাই। টপাটপ খাইয়া গিয়াছি। নীরবে হাসিতে লাগিলাম। অপরাধী শিশুর ন্যায়।

বড়দি কহিলেন, 'কচুরিটা মায়ের ; কিন্তু পেটটা তোমার। এখনও অনেক খাওয়া বাকি। দুপুর আছে, বিকেল আছে, রাত আছে। পেটে একটু জায়গা রাখো।'

আমি লজ্জা পাইলাম। দেখিয়াছি গঙ্গার ইলিশ আসিয়াছে। শ্বশ্রুমাতা ফাটাইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই। ইলিশের প্রতি আমার দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। পুচ্ছদেশ হইতে শুরু করিয়া মুণ্ডে উপনীত হইব। অনেকেই অনেক প্রশংসা পাইয়া থাকেন অনেক অনেক কারণে। কেহ এভারেস্টে উঠিতেছেন, কেহ টেনিস জয় করিতেছেন, কেহ জিন-নামক বস্তুটির রহস্য উদ্ধার করিতেছেন, আমি আমার শ্বশ্রুমাতার প্রশংসা অর্জন করিয়াছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি একটি কথাই বারে বারে বলেন, 'বিনয়কে আমার খাইয়ে সুখ আছে। কোনো কিছুতেই না করে না। যা-ই দাও তা-ই ভাল। একালে এমন আনন্দ করে কারোকে আমি খেতে দেখিনি।' এইরূপ প্রশংসার পরেই তিনি প্রশ্ন করিবেন, 'বলো বিনয় আজ স্পেস্যাল কি খাবে!' সঙ্গে সঙ্গে আমি হয়ত বলিব, চালতার অম্বল, কি আমড়া পোস্ত। এইগুলিকে বলা হইয়া থাকে, এগজোটিক পদ। সহসা যাহা সর্বত্র পাওয়া যায় না।

শ্বশুরমহাশয় ক্ষণপূর্বেই মমতা দেবীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কফি ব্রেক লইয়াছিলেন

ও সংবাদপত্রে পুনরায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, হঠাৎ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। কি একটি পাঠ করিয়াছেন। চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—'রায়বাঘিনী, রায়বাঘিনী।'

তিনি আমার শ্বশ্রুমাতাকে এই নামেই সম্বোধন করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক বন্ধুর মতো। সেই কারণেই একদিন দ্বিপ্রহরে ভূরিভোজের পর নাম রহস্যটি জানিতে চাহিলাম। মৃদুভাষী, কোমল স্বভাবের, সুন্দরী মহিলাটির সহিত ব্যাঘ্রের সাদৃশ্য তিনি কোথায় খুঁজিয়া পাইলেন!

শ্বশুরমহাশয় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই দাঁড়ায়, ইহা ব্যাজস্তুতি। অর্থাৎ মার্জার অপেক্ষাও ভীরু প্রাণীটিকে ব্যাঘ্র বলা। উদাহরণও দিয়াছিলেন, 'অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপূণ, কোনো গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন। কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।' আরো বলিয়াছিলেন, ইহার অন্যদিকও আছে—বাঘিনী বলিতে বলিতে মিউ মিউ স্বভাবটি যদি পালটায়।

দুজনার অসামান্য প্রেম পূর্বেও লক্ষ করিয়াছি, আজও লক্ষ করিলাম। শ্বশ্রুমাতা হাত মুছিতে মুছিতে রন্ধনশালা হইতে স্বামীর আহ্বানে ছুটিয়া আসিলেন। অতিশয় মধুর কণ্ঠে বলিলেন, 'কি বলছ?'

শ্বশুরমহাশয় উল্লসিত কণ্ঠে বলিলেন, 'বুঝলে, আর ভাবনা নেই গো, অবশেষে বেরলো!'

'কি বেরলো!'

'সুগারের যম। ডায়াবিটিস হলে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্যাংক্রিয়াস ট্রানসপ্ল্যান্টেসান চালু হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা কায়দা বের করে ফেলেছেন। প্যাংক্রিয়াসটাকে একটা পলিমারের চাদর দিয়ে মুড়ে তার ভেতর ইনসুলিন প্রডিউসিং সেল বসিয়ে দিচ্ছেন। স্টার্চ খেলেই সুগার, আর হচ্ছে না। মনের আনন্দে খেয়ে যাও, রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশ। কত বড় একটা দুশ্চিন্তা চলে গেল বলো তো! তাহলে আজ রাতে তোমার সেই বিখ্যাত ছানার পায়েস হয়ে যাক।'

শ্বশ্রুমাতা এই সংবাদে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরও উজ্জ্বল হইল। ইহা অবশ্যই একটি সংবাদের মতো সংবাদ। শ্বশ্রুমাতা মাঝেমধ্যেই সুগারের ভয়ে ভীত হইতেন ; কারণ তাঁহাদের বংশে এই ব্যাধিটি আছে। তাঁহার আর দাঁড়াইবার অবসর নাই। আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ

ক্ষোভপ্রকাশ করিলেন ; কারণ আমি মাত্র পনেরটি কচুরি খাইয়া হাত গুটাইয়াছি।

জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা বলিলেন, 'আমি থামতে বাধ্য করেছি। তা না হলে, ও তিরিশে ওঠার তালে ছিল। দুপুরে তো খেতে হবে। তুমি তো আজ আবার ইলিশ ঢুকিয়েছ!'

অন্যায় কি করিয়াছেন, তাহা বোধগম্য হইল না। বর্ষাকালে মেঘে ঢাকা আকাশের ছায়ায় বসিয়া ইলিশের স্বাদে যদি উন্মত্তই না হইতে পারিলাম, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন ধারণের অর্থ কি হইল!

বিশাল এক পেয়ালা চা পরম পরিতোষে পান করিয়া গাত্রোৎপাটন করিলাম। যে বারান্দায় বসিয়াছিলাম তাহা অনেকাংশে লতাবিতানের ন্যায়। অতি মনোরম পরিকল্পনায় বিরচিত। কুসুম সকল ফুটিয়া আছে। সবুজ পত্রশোভা। অকস্মাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিতেছে একটি দুটি টুন্টুক পক্ষী। লতার প্রান্ত ধরিয়া দোল খাইয়া, গান গাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। জায়গাটি স্বর্গের সহিত তুলনীয়। এই সবই আমার শ্বশুরমহাশয়ের স্বহস্তে রচিত। তাঁহার মাত্রাতিরিক্ত অরণ্য—প্রেমের কারণে আমি তাঁহার নাম রাখিয়াছি অরণ্যদেব। তিনি এই উপাধি পছন্দ করিয়াছেন ও জামাতাদের জাতিতে তিনি আমাকে ফক্কড় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার আরও একটি জামাতা আছেন, আমার মেজ শ্যালিকার স্বামী। তিনি তরুণ আই এ এস। উচ্চ সরকারি পদে প্রতিষ্ঠিত। চশমাধারী, গম্ভীর ; একটি বিধ্বস্ত সরকারি জিপে চড়িয়া জেলার প্রশাসন সামলাইয়া থাকেন। মাঝে মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনতা, ইটপাটকেল ও লগুড় সহযোগে তাঁহাকে আদর করিয়া যায়। সেই সোহাগে কিছুদিন দাঁত ছিরকুটাইয়া পড়িয়া থাকিয়া পদাধিকার বলে উঠিয়া দাঁড়ান। পুনরায় কোনও ইস্যুতে আবার শয্যাগ্রহণ করেন। কবে না কবে বিধবা হইতে হয় ভাবিয়া মেজ শ্যালিকা সিঁথিতে সিন্দুর ধারণ করেন না। বলেন সিন্দুরে অ্যালার্জি। অবশ্য ইহাই সত্য, শ্বশুরমহাশয়ের মধ্যম কন্যাটি অতিশয় অহঙ্কারী। অহঙ্কারের কারণ ; স্কুল ফাইন্যালে প্রথম হইয়াছিলেন, পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অহঙ্কারের কারণ থাকিলেও অহঙ্কারী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্র বলিতেছেন, বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। তিনি তাহার বিপরীত পথেই চলিয়াছেন। ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ আমি বাংলা অথবা সংস্কৃতে নহে, খাস-ইংরেজিতে পাঠ করিয়াছি—বাইবেলের লেখা Pride

goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. ধ্বংস হইবার পূর্ব লক্ষণ অহঙ্কার আর উগ্রচণ্ডার দমাস করিয়া পতন হইবেই হইবে। তাঁহাদের জীবনে এমন ঘটুক, আমি তাহা কখনই চাহিব না। আমার মন সেরূপ নহে ; কিন্তু আমি ভয় পাই। যদি ঘটে!

মেজ শ্যালিকা বিবাহের রাতে আমাকে অতিশয় অপমান করিয়াছিলেন। আমি অদ্যাপি তাহা ভুলিতে পারি নাই। আমার দোষ ছিল না, এমন বলিতেছি না, তবে বিবাহের রাত্রে শ্যালিকাদের সহিত রঙ্গ-রস করা চলে। আমি কেমন করিয়া জানিব, ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, আই এ এস পত্নী। তিনি সর্বসমক্ষে, উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'শেষ পর্যন্ত তোমরা একটা লোফারকে জামাই করলে!'

আমি স্তম্ভিতহইয়া বসিয়া রহিলাম। জল ভরা তালশাঁস হাতেই ধরা রহিল। রাত গভীর হইল। রণক্লান্ত সৈনিকরা এধারে, ওধারে কুম্ভকর্ণ। আমার স্ত্রী ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে বুঝাইতে গেলাম—আমি লোফার নহি।

আমার স্ত্রী বলিল, 'আমার মেজদিটা চিরকালের লোফার। বিয়ের পরে এত অহঙ্কার যে নিজের বাপ-মাকেও মানুষ ভাবে না। বড়দি তো ওদের সঙ্গে কথাই বলে না। তুমি কিছু মনে করোনি ত!'

নারীর কথা গায়ে মাখিতে নাই। কেহ মুখ হলসা, কেহ ভেতর বুঁদে। গ্রাম্য প্রবাদেই তো আছে—

মুখ হলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী,
পানাপুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী।

নারী কটর কটর কথা বলিবে, ফ্যাঁস করিবে, ফোঁস করিবে, পুরুষকে সহ্য করিতেই হইবে, তাহা না করিলে সব সংসারই তো ছ্যাতরাইয়া যাইবে। বিবাহের বছর না ঘুরিতেই আদালত। আইনজীবীদের পোয়াবারো। মারিলেও কলসির কানা তাহা বলিয়া কী প্রেম দিব না।

আমার স্ত্রীর নাম অরুণা। বাসরঘরে তাহার গোল গোল হাত দুটি চাপিয়া ধরিলাম। আকাশগাঙ্গে ত্রয়োদশীর চাঁদ সাঁতার কাটিতেছে। প্রথম বসন্তের উতলা কোকিল দেবদারু শাখায় কুহু কুহু রবে হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করিতেছে। পুরানো বধূরা প্রথম রাত্রে ফস্টিনস্টি করিয়া যে যেমন পারিয়াছেন শয়ন দিয়াছেন। আমি আর অরুণা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া প্রভাতের

অপেক্ষা করিতেছি। হঠাৎ আমার প্রেম জাগিল। সন্তর্পণে মুখচুম্বন করিলাম। তালশাঁস সন্দেশটি দুই ভাগ করিয়া দুইজনে চুকুর চুকুর করিয়া খাইলাম। আমার স্থূল বুদ্ধিতে মনে হইল, সন্দেশ বস্তুটি চুম্বন অপেক্ষা অনেক স্বাদু।

এই প্রাক-কথনের প্রয়োজন হইল এই কারণে, বুঝাইতে চাহিতেছি, অপর জামাতা অপেক্ষা কেন আমি প্রিয়! মেজ জামাতা ভেতরবুঁদে, মেজ কন্যা মুখ হলসা। ইনি কথা বলিতে চান না। কারণ পার্সোন্যালিটি লিক করিয়া যাইবে, উনি এত কথা বলেন, যেন উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে বালির ঝড় উঠিয়াছে। অঙ্গে আলপিনের ন্যায় বিঁধিতেছে। অহঙ্কার করিবার মতো কিছু নাই বলিয়া, আমার অহঙ্কার নাই। আমি মজুর শ্রেণী মানুষ। খাইতে ও খাটিতে ভালবাসি। শুইবামাত্রই নিদ্রা যাই। কখনও কোনও স্বপ্ন দেখি নাই ; কিন্তু দেখিতে ইচ্ছা করে। পেট পুরিয়া খিচুড়ি খাইয়া শুইয়াছি, তথাপি স্বপ্ন আসে নাই। এমনি হতচ্ছাড়া আমি।

এখন প্রশ্ন হইল আমার সহিত অরুণার বিবাহ হইল কেন! দুইটি কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি। মধ্যম জামাতা এই পরিবারের সুখ বিধান করিতে পারে নাই। পদমর্যাদার রেশমগুটিকার মধ্যে রেশম কীট হইয়া সাফারি স্যুট পরিয়া বসিয়া আছেন। ফাইল, রিপোর্ট, মেমোরেন্ডাম পোস্টিং, প্রোমোসান ইত্যাদি ইংরেজি বস্তুর মধ্যে ডুবিয়া আছেন। তাঁহার জগতে দুই ভিন্ন তিনের অস্তিত্ব নাই। তিনি আর তাঁহার মন্ত্রী। রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাইতেছেন, তথা হইতে নিজের বাংলোয় ফিরিয়া আসিতেছেন। যাইতেছেন আসিতেছেন, আসিতেছেন যাইতেছেন। প্রাণ হস্তে লইয়া প্রশাসন চালাইতেছেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, কোনওটিই যথাযথ হইতেছে না। ফলে ক্রমশই গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইতে হইতে একটি সরকারি লগ-বুকে পরিণত হইয়াছেন। শ্বশুরালয়ে কখনও আগমন করিলে এমন একটি ভাব করেন যেন শোকসভায় আসিয়াছেন।

আমার শ্বশুরমহাশয়ের তিনটিই কন্যা। চতুর্থটি পুত্র হইলেও হইতে পারিত। সাহস করেন নাই। তাঁহারা একটি পুত্রসম জামাতা চাহিয়াছিলেন, সেই কারণেই আমাকে পিকআপ করিয়াছিলেন। আমাকে একটি অরণ্য সম্পদ বলিয়াও গণ্য করা চলে। আমি আমার পিতার কাষ্ঠের ব্যবসায় তদারকি করিতাম। সরকারি জঙ্গল যখন নিলাম হইত, তখন সেই নিলামে দর হাঁকিতে আমিই যাইতাম। বয়সের কারণে পিতা আর পারিতেন না।

বলিতে দ্বিধা নাই, মহিষাসুর হইলেও আমার বিলক্ষণ কবিতা প্রীতি ছিল। দু-একটি অক্ষম কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিখ্যাত সাহিত্য পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছি, পত্রপাঠ ফিরত আসিয়াছে। আর একটি বিষয়েও আমার অনুরাগ ছিল, উহা সঙ্গীত। ওস্তাদ ধরিয়া শিখি নাই। স্বশিক্ষিত। যে কোনও সঙ্গীত একবার নিলেই আমি গাহিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্ত আমি গিয়াছি। ইচ্ছা করিলে চাকুরি করিতে পারিতাম। পিতা আমাকে মারাত্মক একটি কথা বলিলেন—অন্যের বাসন মাজার চেয়ে নিজের বাসন নিজেই মাজ না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাহার সহিত যাহার বিবাহ হইবে তাহা না কি পূর্বেই ঈশ্বর ঠিক করিয়া রাখেন। তাহা হইলে উদাহরণ হিসাবে আমার বিবাহের কথা বলিতেই হয়। আত্মকথন অতিশয় অশোভন কর্ম। করিতেই হইতেছে, তাহা না হইলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে না।

এক বৎসর কি তাহারও কিছু পূর্বে একটি জঙ্গলে নিলাম ধরিতে গিয়াছি। কয়েকদিন থাকিতে হইবে। শাল, সেগুন, শিমুল, মেহগিনির নিবিড় অরণ্য। ভয়ঙ্কর মনোরম। কয়েক ঘর আদিবাসী ছাড়া কেহ কোথাও নাই। সভ্যতাও নাই, অসভ্যতাও নাই। বনবিভাগের বাংলোয় আশ্রয় লইয়াছি।

এক দিবস প্রাতে বৃক্ষমূলে বসিয়াছি। তাহার ঊর্ধ্বদেশ দেখিতে পাইতেছি না। চতুষ্পার্শ্বে শুষ্কপত্র, বৃক্ষশাখা। খাবলা খাবলা রৌদ্র। পিপীলিকার রেলগাড়ি। কাঠবিড়ালির লাঙুল আস্ফালন। পক্ষীদের সামগান। মনে অতিশয় ভক্তিরসের সঞ্চার হইল। তখন আমি উচ্চকণ্ঠে রামপ্রসাদী গান ধরিলাম নির্ভয়ে। বৃক্ষ ভিন্ন কোনো শ্রোতা নাই। কোথাও কোনও সংবাদপত্রের সমালোচক ঘাপটি মারিয়া বসিয়া নাই। অতএব আমার ভয়েরও কোনো কারণ নাই। যে গানটি আমি গাহিতেছিলাম তাহা হইল—'মন কেন তুই ভাবিস মিছে। মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে!' প্রথমে প্রসাদী সুরেই গাহিতেছিলাম। তৎপরে ভাব কিঞ্চিৎ তরল হইতেই গানটিকে নানা সুরে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রথমে কালোয়াতি, তাহার পরে হিন্দি চলচ্চিত্রানুগ সুরে, পরিশেষে ইংরাজি পপ সুরে। বৃক্ষতলে বেশ মাতিয়া উঠিয়াছি, এমন সময় অরণ্যের বাম পার্শ্বে খচরমচর শব্দ হইল। ভাবিলাম, সুরে মোহিত হইয়া কোনও বৈরাগী ব্যাঘ্র বুঝি আসিতেছে। আমি কিন্তু সঙ্গীত বন্ধ করি নাই। মরিতে হইলে গাহিতে গাহিতেই নারদ ঋষির ন্যায় ঢেঁকিতে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে

যাইব। গোলকবিহারী আমাকে সহকারী করিয়া লইবেন। যে প্রাণীটি সম্মুখভাগে আসিয়া, জিহ্বা নির্গত করিয়া হ্যা হ্যা করিতে লাগিল, সেটি একটি বিশাল আকৃতির অ্যালসেসিয়ান। কালো কুচকুচে গাত্রবর্ণ। কোথা হইতে নেকড়ের এই বংশধরটি আসিল বুঝিতে পারিলাম না। পাছে ঘাঁক করিয়া কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে সঙ্গীত বন্ধ না করিয়া ইংরাজি সুরেই রামপ্রসাদী গাহিতে লাগিলাম। বিদেশি প্রাণী বিলাতি সুরই পছন্দ করিবে। ইহাই ছিল আমার অনুমান।

অতঃপর বামদিকে আবার মচমচ শব্দ। আড়ে তাকাইলাম। স্বপ্ন দেখিতেছি না তো! সপরিবারে আধুনিক রামচন্দ্র বনবাসে আসিলেন কী! সম্ভ্রান্ত দর্শন এক ভদ্রমহোদয়। ওষ্ঠের দক্ষিণ কোণে প্রলম্বিত একটি ৎ আকৃতির পাইপ। পরিধানে হাফ প্যান্ট ও কলারসহ তোয়ালে গেঞ্জি। পায়ে বুটজুতা। সঙ্গে চারজন হালকেতার রমণী। তিনজন মাথায় মাথায় যুবতী। অতিশয় আকর্ষণীয়া। অন্যজন মাতৃমূর্তি।

আমি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলাম। ইহাতে ভদ্রলোক অত্যন্ত খুশি হইয়া কহিলেন, 'কে তুমি?'

বিনীত হইয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে আমি বিনয়।'

পিতা প্রায়ই শুনাইতেন, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি।' তিনি কাষ্ঠ ব্যবসায়ী হইলেও গণিতশাস্ত্রে এম এস সি করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ কালবিলম্ব না করিয়া আমার মাতার পাণিগ্রহণ করাইয়া কাঠের ব্যবসায়ে বসাইয়া দিলেন। সারা দিবস করাতকলের কর্কশ শব্দ। কাঠের গুঁড়া ও ভেষজ সুগন্ধের মধ্যে ঋষির মতো বসিয়া থাকেন। সম্প্রতি সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হইয়াছেন। অরণ্যের অভিজ্ঞতা লিখিতেছেন। রচনায় বিভূতিভূষণের প্রভাব থাকিলেও স্বকীয়তা আছে।

আমি বিদ্বান নহি ; কিন্তু বিনয়ী। বিনয় আমার রক্তে।

ভদ্রমহোদয় প্রশ্ন করিলেন, 'কোথাকার বিনয়?'

'আজ্ঞে কলকাতার বিনয়।'

'এখানে এলে কি করে?'

'নিলাম ধরতে এসেছি।'

'আই সি! তোমার গলা তো বেশ ভাল, তা গানটাকে অমন চটকাচ্ছ কেন?'

বিনয়ে বিগলিত হইয়া, কাচুমাচু মুখ করিয়া বলিলাম, 'গাছ ছাড়া তো কোনো শ্রোতা নেই, তাই সাহস করে একটু এক্সপেরিমেণ্ট করছিলুম। সেই একই পুরনো সুরে গাওয়া হয়। একটু আধুনিক করার কথা ভাবছিলুম।'

ভদ্রলোক পাইপ নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, 'না, ভাববে না। গাছ শ্রোতা নয়, এমন কথাটা তুমি ভাবলে কেমন করে? গাছের তুমি জান কী! তোমার তো মরা কাঠ নিয়ে কারবার! জ্যান্ত গাছের খবর তুমি কতটা জান?'

আমি কিঞ্চিৎ চুপসাইয়া গিয়া অধ্যাপক সম্মুখে অজ্ঞ ছাত্রের ন্যায় মাথা চুলকাইতে থাকিলাম। অল্পবয়সী তিন সুন্দরী আমার তিরস্কার বেশ উপভোগ করিতেছেন। বয়োজ্যেষ্ঠার করুণা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, 'শুধু শুধু বকছ কেন?'

বুঝিলাম স্বামী, স্ত্রী। তিন কন্যাকে লইয়া পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতার কোনো বড় মানুষ নির্জনতা উপভোগের মানসে সপরিবারে বনবাসে আসিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয় স্ত্রীকে বলিলেন, 'গাছের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না।'

আমাকে প্রশ্ন করিলেন, 'শুধু কাঠ নিয়েই আছ, না লেখাপড়াও কিছু করেছ?'

নিজের কথা বলিতে লজ্জা করে, তথাপি বলিলাম, 'আজ্ঞে, এম এস সি।'

তিনি হতচকিত হইয়া বলিলেন, 'এম এস সি! কোন সাবজেক্ট!'

'কেমিস্ট্রি।'

তিনি এইবার ধমকাইয়া উঠিলেন, 'কেমিস্ট্রির এম এস সি, জঙ্গলে মরতে এসেছ কেন?'

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'তুমি এসেছ কেন?'

'ফরেস্ট সার্ভিস নিয়েছি বলেই এসেছি। আই লাভ ফরেস্ট।'

আমি বুঝিলাম ভদ্রমহোদয় এই জঙ্গলমহলের সর্বেসর্বা। হয়তো চিফ কনজারভেটার। আমি কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম, 'আমিও গাছ ভীষণ ভালবাসি।'

ওষ্ঠে পাইপ ঝুলিতেছে তাঁহার। দুই হাতে ধরিয়া আমাকে তুলিয়া বুকে গ্রহণ করিলেন। বিশাল বক্ষদেশ। আমার উপর বাহু দুটি চাপিয়া ধরিয়া পেশিদ্বয় অনুভব করিতে করিতে বলিলেন, 'ফাইন ইয়াংম্যান। রেগুলার

ব্যায়াম করো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ করেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তিনি কন্যাত্রয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'বুঝেছ, একেই বলে ডিসিপ্লিন! তোদের মতো নয়। এই যে অরুণা! আজ গানে বসল তো, সাতদিন অফ।'

আমি বলিলাম, 'গাছের বিষয় কি বলছিলেন। শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে আমি চলতে চলতে বলছি। আমরা হাঁটতে বেরিয়েছি, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না।' তাহাই হইল। আমাদের সামনে চলিয়াছে বিশাল অ্যালসেসিয়ান। তাহার পশ্চাতে আমরা। একবার মাত্র অরুণার দিকে তাকাইয়াছি। মনে হইল চক্ষুতারকায় একটা হাসির ভাব খেলা করিতেছে। অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম, এই হাসির কী কারণ থাকিতে পারে। আমার মাতা বলিতেন, আমার চোখ দুইটি হাতির মতো। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্রোধ হইলে বলিত, আমার নাসিকা লেপচাদের মতো। আমার পিতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলে বলিতেন, একটি শাখামৃগ।

কোনো কথাই হইতেছে না। হাঁটিতেছি। শুষ্ক পত্রনিচয়ের শব্দ। যেন অরণ্যের অদৃশ্য প্রাণীসকল পাঁপর ভাজা চিবাইতেছে। কনজারভেটার মহাশয় ওষ্ঠের কৌশলে ধুম্রপানের পাইপটিকে নানা কায়দায় ওষ্ঠোপরি নাচাইতে, নাচাইতে সহধর্মিণীর স্কন্ধোপরি বামহস্ত রাখিয়া রাজা ক্যানিউটের ন্যায় মহানন্দে বক্ষোদেশ প্রশস্ত করিয়া হাঁটিতেছেন। তিন কন্যা আমার সহিত সন্তোষজনক দূরত্ব রাখিয়া নিজেদের মধ্যেই আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে চলিয়াছে। সন্দেহ হইতেছে, আলোচনার বিষয়বস্তু আমি নহি তো! তিন যুবতী একত্রিত হইলে তাহাদের শক্তি শত গুণ বাড়িয়া যায়। অচেনা পুরুষের নানাবিধ অসঙ্গতি লইয়া মশকরা করা অসম্ভব নহে। ছাত্রজীবনে এই অভিজ্ঞতা আমার কয়েকবার হইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তাহারাও 'প্যাঁক' দিতে পারে। আমি জঙ্গলবাসী টার্জান হইলেও ছাত্রজীবনের সামান্য পড়াশুনার অভ্যাস বজায় আছে। কেন আছে তাহাও বলিতেছি। আমার ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ। বিবাহ করেন নাই। স্বল্প আহার করিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলেই, মঠ-মিশনে গিয়া বক্তৃতা শুনিতেন। তাঁহার জীবনের ব্রতই ছিল, পঠন-পাঠন, শ্রবণ-মনন। ইহার ফলে তিনি মরণোত্তর পুরস্কার পাইয়াছিলেন—

৬স করিয়া স্বর্গে গমন। মৃত্যুর পরে সকলেই একবাক্যে একটি কথাই বলিলেন—'মিসফিট।' যাহা হউক তিনি আমাকে একদিন বলিলেন—এইটি পড়ো, ও হৃদয়ে চিরকালের জন্য গাঁথিয়া রাখো। আমি মুখস্থ করিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে গিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না, কারণ, 'কা-লেস্টা-রল' ভিন্ন অন্য কিছু হৃদয়ে যাইতে পারে না। ডাক্তারবাবুরা তাহাই বলেন। অবশেষে উহাতেই হৃদয় তিনবার ভুকভুক শব্দ করিয়া মোক্ষলাভ করে। আমার অধ্যাপক মহাশয়ের তাহাই হইয়াছিল। তিনি আমাকে তৎকালে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহা এইকালে অজ্ঞান অথবা দুর্জ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথাপি, বলিব যখন বলিয়াছি, বলিয়াই ফেলি, উৎস, এক সুফী সাধক, তাঁহার নাম ঘাজালি। তিনি বলিতেছেন, যাহা বলিয়াছেন, তাহার বাংলা করিলে, এই দাঁড়াইবে, উট মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। হস্তী মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর প্রাণী, সিংহ শতগুণ পরাক্রমশালী, গবাদিপ্রাণী মনুষ্য অপেক্ষা অধিক ভোজন করে, পক্ষী বহুগুণ ক্ষিপ্র ও তৎপর প্রাণী। তাহা হইলে, মানুষের গর্ব কোথায়! মানুষ এই বলশালী, ভোজনশীল, দ্রুতগামী প্রাণীদের মধ্যে আসিল কেন! একটি মাত্র কারণে। মানুষ আসিয়াছে শিক্ষা করিবার জন্য, জ্ঞান আহরণ করিয়া জ্ঞানী হইবার জন্য। সেই উপদেশ অনুসারে মনস্তত্ত্বের বই লইয়া কিছুকাল নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম। কোনো একটি গ্রন্থে পাঠ করিলাম, আমার দিকে কেহ তাকাইলেই আমি খোঁড়াইতে থাকি। তাহা না হইলে আমি স্বাভাবিক ভাবেই পথ চলি। তিন কন্যার হাস্যোল্লাস দেখিয়া আমার মনে ওই কথাটিই উঁকি মারিল। যেহেতু উহারা তাকাইতেছে, সেই হেতু আমি নায়কের মতো হাঁটিতে পারিতেছি না, সেই হেতু উহারা হাসিতেছে। আমার রাগ হইতেছিল। মনে মনে তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলাম, 'বড়লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল। এমন খোঁপা বেঁধে দোবো...।' মনে মনে আবার মুখও ভেঙাইতে লাগিলাম। কারণ বড়লোকি চাল, আঁতলামো ইত্যাদি আমি সহ্য করিতে পারি না।

আমি ক্রমশই আমার দূরত্ব বাড়াইতে লাগিলাম। পিছনে বা সামনে যাইবার পথ নাই। আমার সম্মুখে কনজারভেটার মহাশয়, সস্ত্রীক। পশ্চাতে তিন কন্যা। অতএব আমি ক্রমশই বামপার্শ্বে সরিতে লাগিলাম। বৃক্ষ অপেক্ষা মিগুক বন্ধু আর নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে, রৌদ্র ও পত্রের আলোছায়ার আলপনা গায়ে মাখিতে মাখিতে, পাখির কূজন শুনিতে শুনিতে, আরও গভীরে সরিতে সরিতে,

একসময় মারিব কাট। ইহাই ছিল আমার পরিকল্পনা।

আমার ভাগ্যবিধাতার পরিকল্পনা ছিল অন্যরূপ। পূণ্যতমা প্রাণী স্বর্গে গমন করে। অবশ্য ধূম হইয়া। পুড়িতে পুড়িতে চিতা হইতে রকেট যোগে মহাকাশে। আমার হইল উলটা। আমি সশরীরে পাতালে চলিলাম। কিছু বুঝিবার অবসরই পাইলাম না। পত্রাচ্ছাদিত একটি গভীর গর্তে ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতেছি, এইটুকুই বোধগম্য হইল। অনুভূতি হিসাবে মন্দ ছিল না। ডালপালা ও প্রচুর শুষ্কপত্রাদি ভেদ করিয়া আমার দেহ নামিতেছে। কতদূরে গিয়া শেষ হইবে জানি না। রক্ষা করো, রক্ষা করো, বলিয়া চিৎকার করিতে পারিতেছি না; কারণ মহিলারা রহিয়াছেন। ভীরুতা ও কাপুরুষতা অপেক্ষা মৃত্যু এই ক্ষেত্রে কাম্য। উহারা এমনিই হাসিতেছে, আমাকে এই অবস্থায় দেখিলে, তালি বাজাইয়া অট্টহাস্য করিবে।

চিৎকার না করিলেও, আমার হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যাওয়া তাহারা লক্ষ করিয়াছে ও তিনজনে সমস্বরে চিৎকার জুড়িয়াছে, 'বাবা, ফাঁদে পড়েছেন ভদ্রলোক। বাঁচাও, বাঁচাও।' চিৎকার করিতে করিতে তিন কন্যা ছুটিয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে আমার পদদ্বয় ভূতল স্পর্শ করিয়াছে। উপর দিকে তাকাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলাম। পাতা, ডাল, মৃত্তিকা, কঙ্কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অন্ধ হইবার সম্ভাবনা। এমন প্রাকৃতিক আলিঙ্গন আগে অথবা পরে কখনও পাই নাই। সর্প-দংশনের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। বুঝিলাম অদ্যই শেষ রজনী। ব্রেকফাস্ট করিয়াই বিদায় লইতে হইল, লাঞ্চ ডিনার হইল না। এতকাল আমি খাইয়াছি, এইবার আমাকে খাইবে।

বুঝিতে পারিলাম, গর্তমুখে সকলে সমবেত হইয়াছেন। কনজারভেটার সাহেব মনে হয় পাইপ ধরাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সাবধান করিতেছেন। শুষ্কপত্রে আগুন লাগিয়া গেলে, অমন ছেলেটি স্রেফ কাঠকয়লা হইয়া যাইবে। মা হইয়াছেন তো সেই কারণেই অপত্য স্নেহ জাগিতেছে। কনজারভেটর মহাশয় বলিতেছেন, 'আমাকে জঙ্গল শিখিয়ো না। বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া না দিলে, বাঘে ধরা ফাঁদ থেকে ছেলেটাকে টেনে তুলবো কি করে। গর্তটার ডেপথ্ জানো! গত বছর এইটাতেই সেই বাঘটা পড়েছিল। কান্নিক মারতে মারতে এদিকে এল কি করে! ছোকরার এলেম আছে। তোমরা ঠিক এই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে থাকো মার্কার হয়ে আমি লোকজন ধরে আনি।'

আমি স্বয়ং চেষ্টা করিতে লাগিলাম উঠিবার জন্য। কোটি কোটি শুষ্কপত্রের কচরমচর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই হইল না। বুঝিলাম, গুরুতর পতন হইলে উঠিবার আর উপায় থাকে না। শুনিলাম, তিন কন্যাদের একজন বলিতেছে, 'এখনও বেঁচে আছে!' আর একজন বলিতেছে, 'মরে যাওয়ার তো কোনও কারণ নেই। অকসিজেন তো পাচ্ছে। তবে যদি সাপে কামড়ায় তাহলেই হয়ে গেল।' তৃতীয়জন বলিল, 'একবার ডেকে দেখলে হয়। এই যে, কি করছেন!'

এই অতি বিপন্ন অবস্থাতেও একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম, গভীর রাত্রে এই গর্তে যদি একটি বাঘ আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে আমাকে ভোজন করিতে তাহার কয়দিন সময় লাগিবে। পায়ের দিক হইতে শুরু করিবে, না মাথার দিক হইতে! একটি অখণ্ড মৎস্য আমি কী ভাবে আহার করি তাহা ভাবিবার চেষ্টা করিলাম। ব্যাঘ্রের ভোজন পদ্ধতি আমার জানা নাই।

গর্ত মুখে উচ্ছ্বাস শুনিলাম, 'ওই যে কপিল আসছে হাতি নিয়ে'।

হাতি কী করিতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। গর্তে পড়িলেও মস্তকটি তো হারাই নাই। হাতি হইল প্রকৃতির ক্রেন, শুণ্ডটি পত্রাদি ভেদ করিয়া গহ্বরে প্রবিষ্ট করাইবে, তৎপরে আমি হোসপাইপের মতো সেই বস্তুটিকে আঁকড়াইয়া ধরিব।

তাহাই হইল। উপর হইতে নির্দেশ আসিল। শুণ্ড নামিতেছে। পত্ররাশি ভেদ করিয়া, হাপরের মতো বাতাস ছাড়িতে ছাড়িতে সেই উত্তোলন যন্ত্র আসিতেছে। নির্দেশ আসিল, 'পাকড়ো'। একটি হড়হড়ে, খাঁজকাটা খাঁজকাটা নালীক আমার মুখমণ্ডল স্পর্শ করিল। অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা আমাকে চুম্বন করিল। নিরামিষ গন্ধ পাইলাম। সদ্য সদ্য থোড় অথবা মোচা ভক্ষণ করিয়া শ্বাস ফেলিলে যেরূপ হয়। কনজারভেটার মহাশয় ইংরাজিতে নির্দেশ নামাইলেন, 'ট্রাই টু ক্লাইম্ব দি ট্রাঙ্ক'। আমার তখন জীবনের ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কয়েক সহস্র নানা জাতীয় পিঁপড়া জীবন্ত খাদ্য ভাবিয়া পিকনিক শুরু করিয়া দিয়াছে। শরীরের সর্বত্র তাহারা চাখিয়া দেখিতেছে। ট্রাউজারের অন্তরালে দেহকাণ্ড বাহিয়া তাহাদের অগ্নিপ্রবাহ ধাবমান। মর্মে মর্মে বুঝিলাম কত সত্য সেই বাণী—'পাপের বেতন মৃত্যু।' কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি কাহাকেও অহঙ্কারী, বড়মানুষের কন্যা, আদুরী ইত্যাদি ভাবিয়াছি, মনে মনে মুখ ভেঙাইয়াছি।

প্রত্নতাত্ত্বিক অথবা পুরাতাত্ত্বিকরা ভূগর্ভ হইতে অতীতের কোনো নিদর্শন, ভাঙা কলস অথবা মূর্তি উত্তোলিত হইলে যে-রূপ সহর্ষ উল্লাস প্রকাশ করেন, হস্তীশুণ্ড সহায়ে আমার ক্রমপ্রকাশকে তাঁহারা ঠিক সমান মর্যাদা দিলেন। তিন কন্যা তিনদিকে ঠিকরাইয়া গেলেন, আমার ভয়ে নহে, আমার গাত্র সংলগ্ন পোকামাকড় দেখিয়া। আমাকে জলৌকাও ধরিয়াছে। রক্ত শুষিতেছে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি। আমি উত্তোলিত হইলেও ভূমি স্পর্শ করিবার সুযোগ তখনও হয় নাই। ঐরাবত পৃষ্টে বসিয়া আছি যুবরাজের ন্যায়। হস্তীর মাহুত কপিল যেই তাহাকে সিট-ডাউন ক্যাপটেন বলিল, তখন সে বসিল। আমি ঐরাবত পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমবেত জনতাকে স্যালুট করিলাম। কনজারভেটার সাহেব প্রশ্ন করিলেন, 'আর ইউ অল রাইট?'

তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাটি অতিশয় উদ্বেগ মিশ্রিত গলায় বলিল, 'আপনার লাগেনি তো! ভালো আছেন তো!' আমি হৃদয়ের সুগন্ধ পাইলাম। বুঝিলাম গর্তে পতিত হইবার পূর্বে কন্যার যে দৃষ্টিবাণ বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা ছুঁড়িয়াছিল সেই বালক 'কিউপিড'। ইহাকেই ইংরাজগণ কাব্যাদিতে বলিয়াছেন— লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। আমি উজবুকের ন্যায় বিপরীত ভাবিয়া দূরত্ব বাড়াইতে বাড়াইতে গবাদি পশুর ন্যায় গর্তে পতিত হইলাম। অবশ্য শাস্ত্র বলিতেছেন, প্রেমও এক দুরন্ত গহ্বর। একটি দুর্লঙ্ঘ ফাঁদ বিশেষ।

অজস্র পিঁপড়ার অবিরত দংশনে সর্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গের এমন প্রত্যঙ্গে কামড়াইতেছে যে চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছি, তথাপি বলিলাম, 'না, লাগেনি। ভালই আছি।'

—'তাহলে অমন ছটফট করছেন কেন?'

—'কামড়াচ্ছে। শতশত পিঁপড়ে।'

সমবেত সিদ্ধান্ত এই হইল, যে অবিলম্বে আমাকে অবগাহন স্নান করিতে হইবে। দংশনকারীদের জলে চুবাইয়া মারিতে হইবে। তাহার পর সর্বাঙ্গে কোনো স্নিগ্ধ প্রলেপ। অতএব আবার ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুলিতে দুলিতে করলা নদীর দিকে চলিলাম। কনজারভেটার মহাশয় নির্দেশ দিলেন, দ্বিপ্রহরের ভোজনে আমার নিমন্ত্রণ।

করলা অতিশয় দুঃসাহসী নদী। অবগাহন করিতে করিতে সামান্য দার্শনিক হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, শুরু আর শেষ, এই লইয়াই জীবন। মায়ের কোল হইতে বলটি লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর গড়াইতে গড়াইতে, একদিন ফটাস।

খেল খতম। হস্তী তাহার শুণ্ড দিয়া আমার শরীরে জল স্প্রে করিতেছে। আর আমার ভিতরে একটি শ্রুত সঙ্গীতের কলি গুনুর গুনুর করিতেছে—প্রেম যমুনায় হয়তো বা কেউ ঢেউ দিল ঢেউ দিল রে। আকুল হিয়ার দুকূল বুঝি ভাঙল রে!

এতটা আশা করি নাই। অদূরে বাঁধের উপরে একটি জিপ গাড়ি আসিয়া থামিল। দেখিলাম কনজারভেটার সাহেব ও অরুণা নামিতেছে। অনাবৃত শরীরটিকে জলে ঢুকাইয়া দিলাম। বেদিং বিউটি হইবার ইচ্ছা নাই। তাঁহারা আমার জন্য নতুন তোয়ালে, ধুতি, পাঞ্জাবি, অন্তর্বাস আনিয়াছেন। অরুণা একেবারে সম্মুখে আসিল না। পিতারূপী মহান পর্বতের আড়াল হইতে বলিল, যথেষ্ট হইয়াছে, আর জলকেলি করিবার প্রয়োজন নাই। বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আমি যেন সুবোধ বালকের মতো তাহাদের অনুগামী হই। বেলা যথেষ্ট হইয়াছে। হস্তীর পার্টিসানের অন্তরালে পোশাক পরিবর্তন করিয়া জিপে উঠিলাম। সাহেবই গাড়ি চালাইতেছেন। আমরা দুইজনায় পিছনে বসিয়াছি। উথালপাথাল গাড়ি চলিতেছে। আমরা দোলাদুলি করিতেছি। পাশাপাশি বসিলে চটকাচটকি হইবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। বসিয়াছি সামনাসামনি। আসন সেই ভাবেই স্থাপিত।

যখনই অরুণার পানে তাকাইতেছি, তখনই দেখিতেছি সে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। তাকাইতেছি, তাকাইয়া আছে। যখন তাকাইতেছি না, তখনও তাকাইয়া আছে। এমন নজরবন্দী অবস্থায় বসিয়া থাকার দুঃসহতা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। হঠাৎ অরুণা হাসিতে শুরু করিল। খলখল, খিলখিল হাসি।

থাকিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিতেই হইল, 'হাসছেন কেন?'

উত্তরে হাসিই নির্গত হইল।

আবার প্রশ্ন করিলাম, 'হাসছেন কেন?'

সাহেব গাড়ি চালাইতে চালাইতে বলিলেন, 'ওর একটাই রোগ, হাসি।'

এই কথা শুনিয়া অরুণার হাসি আরও প্রবল হইল, বিষম খাইয়া কাশির মতো। অবশেষে কুঁচি কুঁচি যে প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল তাহা একত্রিত করিলে এই দাঁড়ায়, আমি কী হাঁটিতে হাঁটিতে নিদ্রা গিয়াছিলাম যে গর্তের মধ্যে গপাক করিয়া পড়িয়া গেলাম।

সাহেব উত্তর দিলেন, 'ও কী করবে! গাছ মানুষকে টানে। টানতে টানতে গভীরে নিয়ে যায়। নিরালা নির্জনে। কানে কানে কথা বলে। বিরাটের কথা।

বিশালের কথা। সময়ের কথা, মহাকালের কথা। এক একটা গাছের বয়স জানিস।'

'আপনি যে তখন আমাকে গাছ সম্পর্কে কি বলবেন বলছিলেন!'

'সে-সব কত কথা! বিশাল মহাভারত। তোমাকে যেটা বলতে চাই, সেটা হল গাছ আর গান। বিদেশী দুই বিজ্ঞানী গাছ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করছিলেন। গাছের কী কোনো বোধ-বুদ্ধি আছে! সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে। একটা ঘরে বৃত্তাকারে ফুলের টব, গাছের টব রাখলেন। সব টবেই সমবয়সী ছোট ছোট গাছ। সেন্টারে তাঁরা একটা মিউজিক সিস্টেম রাখলেন। প্রথমে বাজালেন রক মিউজিক। শুধু রক নয়, 'অ্যাসিড রক'। গাছগুলো সব বিপরীত দিকে হেলে গেল। তার মানে অসহ্য লাগছে। সেই গান বন্ধ করে বেশ মিষ্টি, নরম স্প্যানিশ সুর বাজালেন—লা পালোমা। কড়া তাল ও ছন্দের গান। স্টিল ড্রাম ছিল অনুষঙ্গ। গাছগুলো আবার হেলে গেল বিপরীতে। এইবার একটু কম, দশ ডিগ্রি। এইবার তাঁরা বেহালা চাপালেন। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, গাছগুলো গান শোনার জন্যে প্লেয়ারের দিকে পনের ডিগ্রির মতো ঝুঁকে পড়েছে। এইবার তাঁদের মনে হল, পশ্চিমী ও ভারতীয় রাগ সঙ্গীত বাজিয়ে দেখা যাক, কি প্রতিক্রিয়া হয়! প্রথমে বাজালেন বাখ। অদ্ভুত ব্যাপার হল। গাছগুলো যেন শোনার জন্যে স্পিকারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হেলে পড়েছে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, যখন তাঁরা রবিশঙ্করের সেতার বাজালেন। গাছগুলো স্পিকারের ওপর একেবারে শুয়ে পড়ল। পুরো নব্বই ডিগ্রি হেলে গেল জমির দিকে। কী বুঝলে?'

আমি 'আজ্ঞে' বলিয়া নীরব হইলাম।

তিনি বলিলেন, 'গাছকে যা-তা ভেবো না। গাছ হল আত্মা। গাছ কাঁদে, গাছ হাসে, গাছ বিষণ্ণ হয়। এক একটি বৃক্ষ এক একজন সাধক। লেখা-পড়ার অভ্যাসটা বজায় রেখেছ, না ছেড়ে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে না। বজায় রেখেছি। পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'কী পড়ো? গল্প উপন্যাস।'

'আজ্ঞে না, গল্প উপন্যাস একেবারে ভালো লাগে না।'

'কী পড়ো তাহলে?'

'ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনী। ভ্রমণও পড়ি।' গাড়ি চালাইতে চালাইতে অরণ্যদেব কথা বলিবার সময় মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া তাকাইতেছিলেন।

অরুণা বলিল, 'বাবা! আবার সেইরকম হবে গাড়িসুদ্ধ হড় হড় করে খাদে নেমে যাবে। বারে বারে পেছনে তাকাচ্ছ কেন? না তাকিয়ে কথা বলো না।'

'ধুর! একবার হয়েছে বলে কী বার বার হবে! আই হ্যাভ এ নোজ ফর ড্রাইভিং। আই পজেস সিক্সথ সেনস।'

অরুণা আমার দিকে তাকাইয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় হাসিল। বুঝিলাম, পিতাকে সে পুত্রাধিক স্নেহ করে। অরুণা একেবারে আমার সম্মুখে বসিয়া আছে। আমি দুষ্ট প্রকৃতির হইলে, নায়িকার ন্যায় টান টান এই সুন্দরীর সহিত তাহারই পিতার পশ্চাদ্দেশে বসিয়া পুরুষোচিত অথবা পুরুষজাতীয় যে-সকল অপকর্ম করিতে পারিতাম, তাহা বলিতেছি। করি নাই কিন্তু ; কারণ অরণ্যে অরণ্যে বৃক্ষাদির সমাবেশে দিনাতিপাত করিতে করিতে আমি সভ্য হইয়াছি, সুসংস্কৃত হইয়াছি। বৃক্ষ সমূহের ভূমি হইতে আকাশে উঠিবার তীব্র সনাতন তেজ আমি আত্মস্থ করিয়াছি। সন্ধিলগ্নে আলো আর আঁধারের মায়ায় দেবাদিদেব মহাদেবকে যেন বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বৃষারূঢ় সেই সাক্ষাৎ যোগী, চারুচন্দ্রাবতংসং, পরশুমৃগ বরাভীতিহস্তং আপন খেয়ালে মগ্ন হইয়া কাল থেকে কালে চলিয়াছেন। কোন চক্ষে সেই দর্শন হয় তাহা আমি বলিতে পারিব না। তথাপি সংস্কারে, যে পুরুষ বসিয়া আছে পশু হইয়া, সেই তো কুব্জা। বারে বারে কু বুঝাইতে চায়। রাই পক্ষে কেহ নাই। তেমন হইলে আমার পক্ষে যাহা করা স্বাভাবিক হইত, তাহা হইল হাঁটুতে হাঁটুতে ঘর্ষণ। পদ দ্বারা পদ স্পর্শন। লোলুপ দৃষ্টিতে সমুন্নত দুই বক্ষগিরির মধ্যবর্তী উন্মোচিত সঙ্কটসরণীর শোভাদর্শনে বিমুগ্ধ হওয়া। ওই চলিয়াছে তৈমুর-চেঙ্গিজ। অশ্বারোহী লুটেরার দল। আমি স্বেচ্ছায় না করিলেও যন্ত্রযান তাহার ছন্দ এমন হারাইতেছে, যে আমরা থাকিয়া থাকিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িতেছি। ললাটে ললাটে ঠোকাঠুকি হইবার উপক্রম। অরুণার কপালের টিপ আমার ত্রাটক সাধনার সহায় হইতেছে। দৃষ্টি উহাতেই নিবদ্ধ রাখিয়াছি। এক সময় গাড়ি এমন টাল খাইল অরুণা হুড়ুম করিয়া আমার কোলে আসিয়া পড়িতে পড়িতেও পড়িল না।

কনজারভেটার সাহেবের পশ্চাৎপটে এত কাণ্ড হইতেছে, আত্মভোলা মানুষটির কোনো খেয়াল নাই। গড়গড় করিয়া গাড়ি চালাইতেছেন। ওষ্ঠদেশে পিড়িং পিড়িং করিয়া পাইপ নাচিতেছে। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন ঘুমিয়ে পড়লে না কী?'

'আজ্ঞে না।'

'সাড়া শব্দ নেই কেন? জঙ্গলের একটা নেশা আছে। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। গাছের মেমারি আছে জানো? গাছ মনে রাখতে পারে।'

অরুণা বলিল, 'মোটর গাড়িতে গাছের গুঁড়ি ধাক্কা মারে।'

সাহেব কহিলেন, 'উলটো বল্লি, গাছ কোন দুঃখে মারবে! মারে গাড়ি। দুঃখ মানুষকে ধরে না মানুষই দুঃখকে ধরে। আজ পর্যন্ত মানুষ যত অত্যাচার গাছের ওপর করেছে, গাছ তার সিকির সিকিও করেনি।'

আমি বলিলাম, 'মেমারির কথা বলছিলেন।'

'ইয়েস, ইয়েস মেমারি। ভলাডিমির সোলোউখিন তাঁর বই গ্রাসে লিখছেন, গাছ নিয়ে গুনারের পরীক্ষার কথা। গাছ চিৎকার করে না, মারামারি করে না, মদ্যপান করে মাঝরাতে মাথা ফাটাফাটি করে না, বিশাল ছুরি বের করে বন্ধুর বুকে বসায় না, সৈন্যসামন্ত নিয়ে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতে ছোটে না। বৃক্ষের প্রশান্ত জগতে আছে নীরব অনুভূতি, নিভৃত মর্মবেদনা। সাইলেন্ট সাফারিংস। উদাহরণ চাই! প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া তো মানা যায় না। পরীক্ষা করা হল একটা জিরানিয়াম প্ল্যান্টের ওপর। একজন সেই গাছটিকে ছুঁচ দিয়ে খোঁচাল, পাতা ছিঁড়ল, আগুন দিয়ে ছেঁকা দিল। একটা কাণ্ড থেঁতলে দিল। এরপর আর একজন এলেন। তিনি শুরু করলেন পরিচর্যা। আহত গাছের সেবা। পনের কুড়ি দিনের মধ্যে গাছটা সুস্থ হল। এইবার ইলেকট্রোড ফিট করা হল গাছটায়। অনেকটা ইসিজি যন্ত্রের মতো একটা যন্ত্র। অত্যাচারী এসে গাছটার সামনে দাঁড়ান মাত্রই দেখা গেল গাছটা যেন ভয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যন্ত্রে তার স্পন্দনের ঢেউ বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে। রাগে ছটফট করছে। পারলে ছুটে পালায়, কী লাফিয়ে পড়ে নির্যাতনকারীর গলা টিপে ধরে। যাকে বলে ভায়োলেন্ট রিঅ্যাকশন। এইবার সেই গাছটার সামনে যেই এসে দাঁড়ালেন শুশ্রূষাকারী, গাছের অনুভূতি অমনি শান্ত হয়ে গেল। সমস্ত ঢেউ স্থির। ভীষণ ভাললাগায় আচ্ছন্ন। গ্রাফের কাগজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরল রেখা। গাছটা যেন বলতে চাইছে, ইউ আর এ গুডম্যান, লাভিং ম্যান। আই লাভ ইউ। গাছের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বৃন্দাবনের মানুষের কী বিশ্বাস জানো! বৃন্দাবনের প্রতিটি গাছ এক একজন সাধক। চাইনিজরাও একই কথা বলে। বলে, গাছের চেয়ে বড় সাধক কে আছে! একাসনে স্থির, লক্ষ্য— আকাশে। ভূমি থেকে উঠছে ভূমার দিকে। গাছের তলায় বসে সাধন-ভজনের আলাদা আনন্দ। সত্তর সালের অকটোবরে প্রাভদায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল।

প্রাবন্ধিক বলছেন, মস্কোর অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েনসে তিনি একটা পরীক্ষা দেখেছিলেন। একটা বার্লির চারার শিকড় গরম জলে চোবানো হয়েছে। পাতা আর কাণ্ড সব ঠিক আছে। কোনো বিকৃতি নেই; কিন্তু পরীক্ষাযন্ত্রে দেখা যাচ্ছে, গাছটা যন্ত্রণায় কাঁদছে। বিশেষ এক ধরনের ভয়েস রেকর্ডার ব্যবহার করা হয়েছিল। খুব সূক্ষ্ম সুরে ধরা পড়ল বার্লি চারার কান্না। তুমি খুব অন্যায় করছ। জঙ্গল ইজারা নিয়ে নির্বিচারে গাছ কেটে ব্যবসা করছ। নট গুড। ভেরি ব্যাড। তোমাকে আমি মাস মার্ডারার বলতে পারি।'

সাহেব হুঁউ করিয়া একটি শব্দ করিলেন। ভাবিলাম বলি, গাছ না কাটিলে খাইব কী! গাছ হইতে কাঠ, কাঠ হইতে আসবাবপত্র। কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজ। সভ্যতা তো কাগজের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দলিল তৈয়ারি না করিলে ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে কি করিয়া! সন্ধিপত্র, চুক্তিপত্র তো কাগজেই রচিত হইবে। প্রেমপত্র কাগজেই লিখিত হইবে। মানবজাতির ইতিহাস কাগজেই ধরা থাকিবে। আরও বলিতে ইচ্ছা করিল, গোটা পৃথিবীটাই যদি অরণ্য গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে মানুষ বসবাস করিবে কোথায়! জিপ গাড়ি কোথায় চলিবে! আমি বলিলাম না ; কারণ আমার লজ্জা করিল।

গাড়ি গোঁত করিয়া বাংলোয় প্রবেশ করিল। ক্যাঁচ করিয়া ব্রেক মারিলেন। গাড়ি স্থির হইল। জামাতার পোশাকে অবতরণ করিলাম। শঙ্খ বাজিল না। তখনও তো বুঝি নাই, এই যে ঢুকিলাম আর বাহির হইবার পথ পাইব না! অরুণা বলিল, 'চলুন, ভেতরে চলুন। এত গাছের কথা শুনলুম, যে নিজেকে এখন গাছ বলে মনে হচ্ছে।'

সুদৃশ্য বাংলোটি আমার অতিশয় পছন্দ হইল। উদ্যান পরিবৃত, সুসজ্জিত। অর্থ ও প্রতিপত্তি থাকিলে মানুষ এক টুকরা স্বর্গ রচনা করিতে পারে। আলোকিত, ঝলসিত, লতা শোভিত বারান্দায় উপবেশন করিলাম। ভোঁ ভোঁ করিয়া ভোমরা উড়িতেছে। এই প্রাণীটি আমার অতিশয় প্রিয়। দেখিলেই মনে হয় একটি লিচুর বীজ ডানা মেলিয়া উড়িতেছে। বাতাসে রন্ধনের সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে। কনজারভেটর সাহেব ভিতরে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতিশয় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন, আমি কোনও শারীরিক অস্বস্তি বোধ করিতেছি কী না! গম্ভীর হইলেও তাঁহার এবংবিধ প্রশ্নে আমি কোনও আপনজনের সন্ধান পাইলাম। পারিবারিক সূত্রে যাঁহারা আপনজন তাঁহারা সকলেই লেনেঅলা। প্রয়োজনে দন্তবিকশিত করিয়া আসেন। পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইয়া, যাহা বুঝিয়া লইবার তাহা বুঝিয়া লইয়া কিয়দ্দিনের জন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। ছিন্ন চপ্পল পরিয়া আসিয়া ভুল

করিয়া আমার নতুনটি পরিয়া হাওয়া হইয়া যান। বয়স হইলে মানুষের বিভ্রম হইতেই পারে। মানুষ সম্পর্কে আমার পিতার পরিষ্কার ধারণা। তাহাদের দুই জাতি—লেনেঅলা আর দেনেঅলা। প্রতিটি মানুষ ব্যাঙ্কের কাউন্টার। দুইটি ফোকর, একটিতে ডিপোজিট অন্যটিতে উইথড্রল। জমা পড়িতেছে, তুলিয়া লইতেছে।

আমার শরীরে নানারূপ প্রদাহ হইতেছে, তথাপি বলিলাম, সম্পূর্ণ সুস্থই আছি, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, জড় ভরতের ন্যায় বসিয়া না থাকিয়া সর্বত্র বিচরণ করিলে আমার ভালই লাগিবে। রমণীসুলভ লজ্জা পরিহার করাই শ্রেয়। এই বাংলোর পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে বহুবিধ আকর্ষণ। পিছন বাগানে বৃহদাকার রাজহংসের দল অবিরত প্যাঁকোর প্যাঁকোর করিতেছে। সুদৃশ্য স্নানযোগ্য জলাশয় বর্তমান। তাহাতে কুমুদিনী হাসিতেছে। একটি কুঞ্জবন আছে। পিতার নির্মাণ। জ্যোৎস্না রাত্রে পরীরা তথায় নৃত্যগীতাদি করিলেও করিতে পারে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই মনোরম অঞ্চলটির উদ্দেশ্যে চলিলাম। যাইবার পথে পাকশাল। কন্যাত্রয়ের জননী সস্নেহে আমার দুই হস্তে দুইটি গরম বেগুনি ধরাইয়া দিলেন। দেখিলাম অরুণা অলিন্দে বসিয়া কি করিতেছে, তাহার মস্তকে একটি চকচকে রবারের টোপর। তাহার মধ্যে কেশদাম লুক্কায়িত। মুখমণ্ডল হলুদ পদার্থে আবৃত। অনুমানে বুঝিলাম ভেষজ রূপচর্চা হইতেছে। দুগ্ধ, ময়দা ও হলুদ সহযোগে প্রলেপটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। চকিতে তাকাইয়া ঝটিতি উদ্যানে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। অপূর্ব সেই উদ্যানের শোভা। দুগ্ধধবল রাজহংস সকল সদম্ভে বিচরণ করিতেছে। একটি বকুলের তলে রক্তলাল বেদী। কয়েকটি পারগোলা স্থানে স্থানে নির্মিত হইয়াছে। শোভা দেখিয়া আমি হতভম্ব। অতঃপর আর একটি দৃশ্যে আমার বাক্যরোধ হইয়া গেল। কনজারভেটার সাহেব কোদাল দিয়া মাটি কোপাইতেছেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ইয়াংম্যান শীত আসছে ফুল ফোটাতে হবে।'

আমি বলিলাম, 'ছেড়ে দিন আমি কুপিয়ে দিচ্ছি।'

তিনি বলিলেন, 'এইটাই আমার আনন্দ। আমার একসারসাইজ। কাঁধ আর কোমর খুব ফিট থাকে। বয়েসে ওই দুটোই তো ট্রাবল দেয়।'

তিনি আবার কোদাল চালাইতে লাগিলেন। মাটি খাবলা খাবলা হইতে লাগিল। অদ্ভুত সোঁদা সোঁদা গন্ধ। মৃত্তিকার গন্ধে গণতন্ত্রের সুবাস। মনে হইতেছিল ধুতি পাঞ্জাবি খুলিয়া নামিয়া পড়ি। অবশেষে তাহাই হইল।

মালকোঁচা মারিয়া নামিয়া পড়িলাম। তিনি কোপাইতে লাগিলেন, আমি ইনকিলাব ধ্বনি দিতে দিতে মাটির ঢেলা চূর্ণ করিতে লাগিলাম মহানন্দে। কখনো থ্যাবড়াইয়া বসিয়া পড়িতেছি, কখনো শুইয়া পড়িতেছি।

কনজারভেটার সাহেব একসময় বলিলেন, 'তুমি দেখছি পাগলামিতে আমার ওপরে যাও।'

ব্যাপারটা এতই জমিল যে আহারে বসিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। এতই ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া উপাদেয় খাদ্যসকল গোগ্রাসে খাইতে লাগিলাম। কাহারও পানে তাকাইবার অবসর নাই। সকলে একত্রেই বসিয়াছি, কিন্তু অর্জুন যেমন মৎস্যের চক্ষুটিই দেখিয়াছিলেন বাণবিদ্ধ করিবার সময় সেইরূপ আমিও খাদ্যই দেখিতেছি, অন্যান্য খাদকদের দেখিতে পাইতেছি না। তবে অরুণার অনর্গল কথা কানে আসিতেছে। তাহার মাতা বলিতেছেন, 'খেতে খেতে অত কথা বলিস কেন? বিচ্ছিরি অভ্যেস। আমার ছেলেটাকে দেখ?'

ছেলে সম্বোধনে আমি এমত অভিভূত হইলাম, চক্ষে জল আসিয়া গেল। মাত্র অর্ধদিবসের পরিচয়ে তাঁহারা আমাকে এতটাই আপন করিবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই। কতবার যে কত পদ লইলাম হিসাব রহিল না। অবনত মস্তকে ঘাড় নাড়িতেছি ও পাতে আসিয়া পড়িতেছে। নিমেষে উদরে। কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া নিজেকে মনে হইতেছে। বড়দি থাকিয়া থাকিয়া উৎসাহ দিতেছেন, 'চালিয়ে যাও ভাই, এমন মানুষকে খাইয়েও আনন্দ।' মেজদি মাত্র বলিলেন একবার, বেশী ভোজন করিলে মানুষের পরমায়ু কমিয়া যায়। দীর্ঘদিন যদি খাইতে চাও তাহা হইলে কম খাও। এই মন্তব্যের জন্য সকলেই তাহাকে ধমক দিলেন। এক ভোজনবীর দিল খুলিয়া খাইতেছে, ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য! 'ব্র্যাভো, ব্রাভো, চালিয়ে যাও।'

আহারাদির পর শেষ বেলার স্নিগ্ধ আলোকে উদ্যানে ঘুরিতে লাগিলাম, কদম্ব ও কৃষ্ণচুড়ার ছায়ায় ছায়ায়। দু-এক কলি গান ভাঁজিবার চেষ্টা করিলাম। উদর অতিরিক্ত পূর্ণ থাকায় সঙ্গীতের পরিবর্তে উদ্‌গার উঠিতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলাম নারীকণ্ঠ, 'ব্যর্থ চেষ্টা। ভর পেটে গান হয় না ভাই।'

তাকাইয়া দেখিলাম বড়দি। একটি বেদীর উপর বসিয়া সোয়েটার বুনিতেছেন। ডাকিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইলেন। আলুলায়িত কুন্তলে দেবী সরস্বতীর মতো দেখাইতেছে। অদূরে একটি রাজহংস তাঁহার বাহনের ন্যায় স্থির হইয়া আছে।

নারীর প্রতি আমার আসক্তি নাই; কিন্তু সুন্দরী রমণী দেখিতে আমার ভালো লাগে। বড়দির পার্শ্বে অতি সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছি। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতে পারিতেছি না।

তিনি বলিলেন, 'তোমার কী পেটব্যথা করছে?'

'আজ্ঞে না। আমার পেটে কোনো সমস্যা নেই।'

'তাহলে অমন সিঁটিয়ে বসে আছ কেন?'

উত্তরে আমি নির্বোধের মতো হ্যা হ্যা করিয়া হাসিলাম।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার মনে পাপ আছে?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার মতো বুদ্ধি আমার নাই। মন আছে। নানা কথা মনে রাখিবার ক্ষমতা আমার আছে। ব্যবসায়-বুদ্ধিও আমার কম নয়। পিতার ব্যবসা যোগ্যতার সহিত চালাইতেছি। যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তথাপি পাপ কাহাকে বলে, পূণ্য কাহাকে বলে আমার বোধে নাই। আমি হাত কচলাইতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন, 'মেয়েদের সঙ্গে তুমি সহজ হতে পার না। সকালে আমাদের ভয়ে তুমি গর্তে পড়ে গেলে। এখন তোমাকে বসতে বললুম, দাঁড়ের পাখির মতো ঝুলছ। কিসের এত ভয় বাছা! মেয়েরা বাঘ না ভাল্লুক!'

এই কথা শুনিয়া আমাকে আমার ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা বলিতেই হইল। পাড়ারই এক কন্যা আমারই শ্রেণীতে মহিলা বিদ্যালয়ে পড়িত। তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। পুস্তক ও খাতাপত্রের আদানপ্রদান হইত। হইতেছে, হইতেছে। কোথাও কোনো গোলযোগ নাই। এইবার সেই রমণী কী সর্বনাশা কাণ্ড করিল! আমারই একটি খাতার ভিতরের কোনো একটি পাতায় সে আমারই উদ্দেশ্যে একটি প্রেমপত্র লিখিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে 'প্রিয়তম', 'শত চুম্বন', 'চটকুমটকু', 'ইলিবিলি' ইত্যাদি নির্বোধশব্দের প্রতুল প্রয়োগ ছিল। আমি পত্রটি দেখি নাই। দেখিলে দুষ্ট দন্তের ন্যায় উৎপাটিত করিতাম। সন্ধ্যাবেলা পড়াইতে আসিয়া আমার গৃহশিক্ষক উহা আবিষ্কার করিলেন। দেখিলাম মনোযোগ সহকারে কিছু একটা পাঠ করিতেছেন। ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইতেছে। অতঃপর এমনই উল্লসিত হইলেন যেন কলম্বাস সাহেব আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। চেয়ার ত্যাগ করিয়া ক্রোধে কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিলেন। যতই প্রশ্ন করি, কী ভুল হইয়াছে বলুন সংশোধন করিব। ততই তিনি একটি মাত্র শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, চরিত্রহীন। অবশেষে আমার পিতার

অনুমতি লইয়া, একাই একশো হইয়া উত্তম-মধ্যম পিটাইতে লাগিলেন ও ইংরাজিতে যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহার অর্থ, টাকা হারাইলে কিছুই হারায় নাই, স্বাস্থ্য হারাইলে কিছু হারাইল, চরিত্র হারাইলে সর্বস্ব হারাইল। প্রহৃত হইতে হইতে মনে হইয়াছিল, প্রেম নামক আমেরিকায় আমি শেষ রেড ইন্ডিয়ান। প্রহারে সর্ব শরীর রক্তিম। সেই হইতেই নারী-সম্পর্কে আমি অতিশয় সাবধানী। কী হইতে কী হইয়া যাইবে কে বলিতে পারে!

সব শ্রবণ করিয়া তিনি মুচকি হাসিলেন ও দ্রুত কয়েক ঘর সোয়েটার বুনিলেন। ওই হাসি যে বিধাতারই হাসি তখন তাহা বুঝি নাই। দুটি চপল কাঠবেড়ালি আমাদের প্রদক্ষিণ করিয়া বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া আবার উপরে চলিয়া গেল। রাজহংস প্যাঁক করিয়া বাহবা দিল।

দূরে দেখিলাম, অরুণা একটি বল লইয়া বাঘা অ্যালসেসিয়ানটিকে দৌড় করাইতেছে। একবার তাকাইয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম, আবার তাকাইলাম। চক্ষুদ্বয় যেন কম্পাসের কাঁটা। সদাই উত্তরে মুখ ফিরাইতে চায়। বড়দি বোধকরি আমার এই চৌর্যবৃত্তি লক্ষ্য করিতেছিলেন। একটি দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন ছুঁড়িলেন, 'কেমন লাগছে?'

আমি চমকাইয়া বলিলাম, 'ভীষণ ভালো! যেন স্বর্গে আছি।'

'দু-একটা অপ্সরা থাকলে আরো ভালো হত। কী বলো?'

আমি হাসিলাম। তিনিও হাসিলেন। আমিও আবার হাসিলাম। ইতিমধ্যে কুকুরের সহিত ছুটিতে ছুটিতে অরুণা আমাদের দিকে চলিয়া আসিল। জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়িতেছে। আমি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। মন যেন মনে মনে বলিল, আহা! কী সুন্দর! পুরুষের চক্ষু, নারীর বক্ষ। নিয়ন্ত্রণে আনিব কী করিয়া।

অরুণা বেশ একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলিল, 'বসে আছেন কী! একটু দৌড়াদৌড়ি করতে পারছেন না। বাতে ধরবে যে!'

সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীরবেগে যে-কোনও একদিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। কুকুরটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। খচরমচর শব্দ হইতেছে। কনজারভেটার সাহেব বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন। তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, 'পারো বটে!'

হঠাৎ দেখিলাম, তিনিও আমার সহিত ছুটিতে লাগিলেন। দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল। কে হারে কে জেতে। সেই বিশাল উদ্যানের এক প্রান্ত

হইতে আর এক প্রান্তের দূরত্ব কম হইবে না। আমিই প্রথম হইতে পারিতাম; কিন্তু বয়সের প্রতি সম্মান জানাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া হারিয়া গেলাম। এই পরাজয়ে জয়ের অধিক তৃপ্তি অনুভব করা যায়। আমাদের দৌড় সেই বেদীর কাছে শেষ হইল, যে স্থলে বড়দি সোয়েটার বুনিতেছিলেন। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন, 'পারো বটে।' তাহার পর পৃষ্ঠদেশে সোয়েটারটি ফেলিয়া মাপ লইতে লইতে বলিলেন, 'তোমার জন্মদিনে এইটা উপহার দোবো।'

একপাশে অরুণা বসিয়াছিল। সে বলিল, 'কেমন দৌড় করালুম!'

বড়দি বলিলেন, 'ভারি বাধ্য ছেলে, বলা মাত্রই ছুট।'

সাহেব বলিলেন, 'চলো এইবার একটু গাছের পরিচর্যা করা যাক।'

বড়দি বলিলেন, 'চা আসছে। চা খেয়ে যা করার করো।'

অরুণা বলিল, 'এতকাল তো আমিই তোমার অ্যাসিস্টেন্ট ছিলুম, আজ আমাকে ত্যাগ করলে!'

'ত্যাগ করব কেন? তিনজনে মিলে করব। আজ সার দিতে হবে। তুই তো গন্ধ, গন্ধ বলে নাকে চাপা দিবি।'

গাছ কাটা কাঁচি, জল সেচনের ঝারি, সারের ক্যান, খুরপি প্রভৃতি বাহির হইল। সুদৃশ্য পেয়ালায় সুগন্ধী চা পান করিয়া আমরা তিনজনে মার্চ করিয়া কর্মস্থলের দিকে যাত্রা করিলাম। সেই পরিবার-ভক্ত অ্যালসেসিয়ানটিও আমাদের সহিত মহানন্দে নাচিয়া নাচিয়া চলিল। বেলা শেষের আলোয় বাংলোটিকে পটে আঁকা ছবির মতো দেখাইতেছে। মনে মনে ভাবিলাম, জীবন কত সুখের। পৃথিবী কত সুন্দর! পরিশ্রম করিব, প্রকৃতিকে ভালোবাসিব ও মানুষের ভালোবাসায় বাঁচিয়া থাকিব। ক্রমে এক সুখী বৃদ্ধ হইব, তখন অনন্তের ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাইব।

গাছের ডাল কাটিতে কাটিতে ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে, অরুণার সহিত সখ্য জন্মাইল। কাছাকাছি, পাশাপাশি বসিলেই যে এইরূপ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অরুণা অতিশয় সরল। সেই কারণে, সে কখনো আমাকে ধমকাইতেছে, অপদার্থ বলিতেছে, কয়েকবার হাঁদা বলিয়াছে, মাটি মাখা হাতে তিনবার মাথায় চাঁটা মারিয়াছে। আমার সব কার্যই কিঞ্চিৎ ধুমধাড়াক্কা টাইপের। ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনি। ঘাস নিড়াইতে বলিয়াছিল, ঝুঁটি ধরিয়া এমন টান মারিলাম কয়েকটি পুষ্প চারা উৎপাটিত হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অরুণা বলিল, 'অকাজের শিরোমণি'। তাহার পিতা সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন ও ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। একবারও ভাবিতে পারিতেছি না, এই রমণী কী আমাকে বশীকরণ করিয়াছে। নারী রজ্জুবিশেষ। অসীম তাহার বন্ধনশক্তি।

অবশেষে রাত্রি আসিল। আমি আমার বাংলোয় প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। সেই স্থলে আমার যথাসর্বস্ব পড়িয়া আছে। আমার সহিত সদাসর্বদা একখণ্ড গীতা থাকে। আমার শক্তির উৎস উহার মধ্যে বসিয়া শ্রী ভগবান অবিরত বলিতেছেন, কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নহে। কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'এবার তাহলে আমি আসি।'

মেজ কন্যাটি ছাড়া সকলেই সমস্বরে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, 'যাবে মানে! কোথায় যাবে?'

অরুণা যোগ করিল, 'এবার তাহলে বাঘে খাবে।'

সেই মুহূর্তে শিল্পী শিল্পী চেহারার ফিনফিনে এক যুবক, বগলে তম্বুরা লইয়া প্রবেশ করিলেন। এক গাল হাসিয়া বলিলেন, 'ইমনের সময় চলে যায়। এখুনি না বসতে পারলে ধরা যাবে না। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।'

সাহেব বলিলেন, 'ছোটাছুটির প্রয়োজন নেই। বসে পড়ে ধরে ফেলো।'

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তম্বুরা ম্যাও ম্যাও শব্দ জুড়িল। সুর বাঁধা হইতেছে। অরুণা আমার কানে কানে কহিল, 'কত রকমের পাগল আছে! এখানকার ফরেস্ট অফিসার।'

তিনি ততক্ষণে তম্বুরা উঁচাইয়া ফেলিয়াছেন। বাম কর্ণ বামহস্তের দ্বারা চাপিয়া, মুখ ব্যাদান করিয়া বিশাল এক হুঙ্কার ছাড়িলেন, যেন রাত্রির অরণ্যে রয়াল বেঙ্গল ডাকিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মেজকন্যা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাহাকে দ্রুত পলায়ন বলা যাইতে পারে। যেন প্রকৃতই বাঘে তাড়া করিয়াছে। গায়ক লক্ষ্য করিয়াছেন, সুর ভাঁজিবার ফাঁকেই বলিলেন, 'যাঃ পালিয়ে গেল।'

সাহেব বলিলেন, 'উচ্চাঙ্গের জিনিস সকলের সহ্য হয় না। ডোন্ট মাইন্ড! গো অন।'

তিনি তখন একটি উৎকট তান মারিয়া বলিলেন, 'এইসব কাজকর্ম আমি অরুণাকে দিয়ে যাব। এসব গুরুমুখী বিদ্যা।'

মন্তব্যটি শায়েরির মতো নিক্ষেপ করিয়া তিনি পুনরায় সঙ্গীতের বন্দিশে

আসিলেন। মন্দ গাহিতেছেন না। যৎপরোনাস্তি আবেগ ঢালিতেছেন। কেমন যেন সন্দেহ হইল, এই আবেগের উৎস কোনও নারী, এবং তিনি এই ঘরেই বিদ্যমান। আমার অঙ্গুলিতে ত্রিতালের ছন্দ খেলা করিতেছিল। একসময় বলিয়া ফেলিলাম, তবলা থাকিলে বাজাইবার চেষ্টা করিতাম।

'আপনি তবলা বাজাতে পারেন?' অরুণা বিস্ময় অথবা ব্যঙ্গ প্রকাশ করিল।

আমি মস্তক অবনত করিয়া অপরাধীর ন্যায় হাত কচলাইতে লাগিলাম।

একজোড়া তবলা আসিল, হাতুড়ি ও পাউডার আসিল। আমার গুরুর নাম স্মরণ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। তবলায় হাত লাগাইবা মাত্র আমার অন্তরে এক ওস্তাদের সত্তার প্রকাশ ঘটিল। একটি রেলা ছাড়িতেই সকলে হইহই করিয়া উঠিলেন। সাহেব বলিলেন, 'আরে এ তো শান্তাপ্রসাদ!' ঘরানাটি তিনি ঠিকই ধরিয়াছেন। আমি তাঁহারই শার্গিদ।

অরুণা সোফা হইতে নামিয়া আমার বামপার্শ্বে কিয়দ্দূরে বসিল। গায়ক কটমট করিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিলাম, হরধনু কাহার জন্য ভঙ্গ হইবে! গায়ক তম্বুরা মিয়াও মিয়াও করিতে করিতে বলিলেন, 'অরুণা, ওখানে কেন! আমার পাশে এসে বসো। তোমাকেও গাইতে হবে।'

অরুণা পরিষ্কার বলিল, 'আজ আমার গলার অবস্থা খুব খারাপ। আপনি একাই করুন।'

ভদ্রলোক বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তেড়ে গান ধরিলেন, তারানা সহযোগে, তুম নানা, তোম নানা। আমিও ছাড়িবার পাত্র নহি। অদৃশ্য একটি প্রতিযোগিতা শুরু হইল। অনেকেই শ্রোতা, আমরা একজনকেই শোনাইবার চেষ্টা করিতেছি, সে হইল অরুণা। অকারণেই আমি অরুণাকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার মন দুর্বল হইয়াছে। মনে হইতেছে, বহুকাল পরে আমি পুনরায় প্রেমে পড়িলাম। অখিলবন্ধু মহাশয়ের সেই গানটি আমার মনে ভাসিতেছে—ও দয়াল বিচার করো, আমায় গুণ করেছে আমায় খুন করেছে। মেয়েটির মহিমায় আমি মোরোব্বা হইয়া গিয়াছি। আমার মাতা যাহা বলিতেন আজ বুঝিতেছি তাহা অতিশয় সত্য। সন্ধ্যাকালে মেয়েদের বাতাস গায়ে লাগিলে মানুষ বশীভূত হইয়া যায়। কামরূপ, কামাক্ষায় যত মেষ ঘুরিতেছে তাহারা সকলেই এককালে মনুষ্য ছিল, ওই স্থলের সুন্দরী রমণীরা তাহাদের মায়ায় সকলকে মেষ বানাইয়া ছাড়িয়াছে।

গায়কের সহিত আমার জবরদস্ত সঙ্ঘর্ষ শুরু হইয়াছে। আমি ছন্দে এমন

বোল ছাড়িতেছি যে, তিনি সামলাইতে পারিতেছেন না। মাঝে মাঝে সম চাপিয়া, আড়ি মারিয়া আমাকে কাহিল করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেই ফাঁপরে পড়িতেছেন। আমার ভিতরে অসম্ভব এক শক্তি আসিয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ গতিতে একমাত্রার ভিতরেই এমন বোল ভাগ করিতেছি যে নিজেই অবাক হইয়া যাইতেছি। জায়গায় জায়গায় শ্রোতারা ফটাফট করিয়া হাততালি দিতেছেন।

পরিশেষে অনুরোধ আসিল, তুমিও একটি গান গাও। গায়ক মহাশয় ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, 'আপনি আবার গানও করেন বুঝি!'

ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা শুনিলে আমি ক্ষিপ্ত হইয়া যাই। এই স্বভাবটি আমার উত্তরাধিকার। আমার পিতাকে যখন পরিচিতজনেরা উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, কাঠের ব্যবসায় গুজরাতিদের সহিত তুমি পারিবে না, কেন কাঠের চিতায় অকালে চড়িবার প্রয়াস পাইতেছ! আমরা পিতা এই শুনিয়া করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

আমি অন্য কোনো সহজ গান ধরিবার পরিবর্তে ধরিয়া বসিলাম মিশ্র খাম্বাজে একটি ঠুংরি—লাগে তোসে নয়ন। উন্মুক্ত গবাক্ষে রাতের অরণ্য ঘন হইয়া আছে। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। পরিচ্ছন্ন বাতাস। জোনাকির বিন্দু বিন্দু আলো নৃত্য করিতেছে। সুর লাগাইবা মাত্র, ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব যাহা কিছু ছিল সকলই ঘুমাইয়া পড়িল। সদ্যোজাত প্রজাপতির ন্যায় আমি সুরের আকাশে ভাসমান হইলাম। লাগি তোসে নয়ন, মোরিয়ালি উমারিয়া। সুরে এমনই নিমজ্জিত হইলাম, সেই ঘরখানি অদৃশ্য হইল। তাহার পরিবর্তে রচিত হইল একটি দরবার। জাফরির পরপার্শ্বে উমরাওজান। স্বর্ণখচিত জোব্বায় বাদশাহ ময়ূর সিংহাসনে। পাত্রমিত্র, সভাসদাদি। আমার দুই চক্ষে ভাবাশ্রু টলটল করিতেছে। গানটি শেষ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাগেশ্রীতে ধরিলাম, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে। গানটি সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলাম, সৌম্যদর্শন ঋষি এক, একাকী দাঁড়াইয়া আছেন দুস্তর এক নদীর তীরে। অন্ধকারে ভাসিয়া যাইতেছে একটি তরুণী। আবেগ সামলাইতে না পারিয়া আমি ছুটিয়া বাহিরের উদ্যানে চলিয়া গেলাম। চন্দ্রোদ্ভাসিত অরণ্য আমাকে আহ্বান করিতেছে, ওরে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা। সুরের ঠেলা ও অরণ্যের আহ্বানে আমি প্রকৃতই দৌড়াইতে আরম্ভ

করিলাম। কোথায় যাইতেছি জানি না। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী একপদে জৈন সাধকদের মতো দণ্ডায়মান। ঝিঁঝির তার সপ্তমে বাঁধা গলায় তীব্র সঙ্গীত। কোনো এক জাতির প্রাণীর করাত দিয়া কাঠ চিরিবার মতো শব্দ। কখনো কোথাও পত্রাবলী ভেদ করিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে মায়ামুকুরের ন্যায়। ঝমঝম শব্দে মল বাজাইয়া কোথাও নাচিতেছে শজারু সুন্দরী। মত্ত হস্তীযূথ দূরে কোথাও সমবেত বৃংহণে বনভূমি কম্পিত করিতেছে। অবশ্যই মৈথুনের উল্লাসে। ছায়ান্ধকারে ভল্লুক কোথাও মাতাল হইয়া শুইয়া আছে কী না বুঝিতে পারিতেছি না। আমি অদ্ভুত এক নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া চলিয়াছি। স্বর্গের সমস্ত অপ্সরা একত্রিত হইয়া অরুণার মূর্তি ধরিয়া জোৎস্না রঙের আঁচল উড়াইয়া আমাকে ইশারায় ডাকিতেছে। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, বৃক্ষের জগৎ অতিক্রম করিয়া, চলো যাই কোনো স্রোতস্বতীর তীরে। পরপারে নীল পর্বতের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া আছে অন্ধকার অরণ্য। শতশত বিদেহী আত্মা আলোকের ফুলকি হইয়া উড়িতেছে। তিক্ত গন্ধের আমেজে আমার নেশা ক্রমশই চড়িতেছে। পথের শেষে যদি মৃত্যু থাকে তাহা হইলেও আমার ভয়ের কোনো কারণ নাই। এমনি চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান।

অকস্মাৎ আমি এক নদীর কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উপল বিছানো ঢালু তটভূমি সেই নদীতে নামিয়া গিয়াছে। অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের মতো শব্দ করিয়া নদী চলিয়াছে, উপলে উপলে চরণচিহ্ন ফেলিয়া। দুগ্ধধবল চন্দ্রকিরণে স্নাত চরাচর। আকাশ এক নীল মায়া। ইহাতেই বিস্ময়ের শেষ নহে, দিগন্তে উদ্ভাসিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। শীর্ষে তুষার মুকুট। ধ্যানে বসিয়াছেন দেবাদিদেব মহাদেব।

এক নিশ্বাসে জলের কিনারায় নামিয়া পড়িলাম। কোনো ভয় নাই। বন্যপ্রাণী জলপান করিতে আসিবে সেই আশঙ্কায় এতটুকু বিচলিত হইলাম না। এই রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইলেও আমার কোনো দুঃখ নাই। মনে হইল, এই স্থান হইতেই জীবাত্মা পরমাত্মার দিকে যাইতে পারে।

আমি একটি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলাম। ধীরে ধীরে আমি ধ্যানমগ্ন হইতেছি। আমার শরীরের বহিরাবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির সহিত মিশিয়া যাইতেছে। অরণ্য, পর্বত, জল, স্থল সব একাকার হইতেছে। রেণু রেণু আলোকধারা একতানে একই ছন্দে নৃত্য করিতেছে। এমন বিশাল অনুভব আমার কখনও হয় নাই। আমার কণ্ঠ হইতে সুর নিঃসৃত হইল। ইমন কল্যাণে

দূর আকাশের রজত মৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে শোনাইতে লাগিলাম রবীন্দ্রনাথের গান,

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে॥
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্তলোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

একবার, দু'বার, বারবার আমি গানটি গাহিলাম। সুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হইয়া ভাসিয়া চলিল! আজ আমি বড় এক শ্রোতা পাইয়াছি। 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥'

একসময় হঠাৎ আমি চমকিত হইলাম। পাখির কূজনে বনভূমি মুখর হইল। চন্দ্র তাহার মায়া অঞ্চল গুটাইয়া লইয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার রজত মুকুট ক্রমে স্বর্ণ মুকুটে পরিণত হইতেছে। রাত্রি বিদায় লইল। কোনো বন্যপ্রাণী আমাকে আক্রমণ করে নাই। পরপারে তাহারা আসিয়াছিল। জলপান করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমি উঠিলাম। পথ চিনিয়া আমাকে আমার বাংলোয় ফিরিতে হইবে। যতদূর স্মরণে আছে, সোজাই আসিয়াছিলাম। সেইভাবেই ফিরিতেছিলাম। অরণ্যে পথ হারানো অতি সহজ ব্যাপার। অনেকক্ষণ আসিবার পর রাস্তায় উঠিলাম। কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর, একটি গাড়ির শব্দ পাইলাম। পিছন দিক হইতে আসিতেছে। পথ দিবার জন্য এক পার্শ্বে সরিয়া গেলাম। জিপ গাড়িটি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই, আরোহীরা সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ওই যে, ওই যে যাচ্ছে!'

গাড়িটি আমার পার্শ্বে আসিয়া ক্যাঁচ করিয়া থামিল। আরোহীরা সকলেই লাফ মারিয়া নামিলেন। কনজারভেটার সাহেব, অরুণা, বড়দি, রাতের সেই গায়ক, একজন ফরেস্ট গার্ড। কাহারো মুখে কোনো কথা নাই। কয়েক হস্ত ব্যবধানে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহারা আমাকে দেখিতেছেন। আমিও দেখিতেছি। হঠাৎ অরুণা চিৎকার করিয়া বলিল, 'আপনাকে মারা উচিত।

অসভ্য স্বার্থপর!' বলিয়াই, সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কনজারভেটার সাহেব পাইপ চাপিয়া বলিলেন, 'কোথায় কাটালে সারারাত। আমরা তোমার বাংলোতে সারারাত ছিলুম। ফরেস্ট গার্ডরা গোটা জঙ্গল বারে বারে খুঁজে এল। ছিলে কোথায়!'

বড়দি বলিলেন, 'তোমার মাথায় কী আছে!'

অরুণা জলভরা বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। দীর্ঘ আঁখিপল্লব জলসিক্ত। আমি কোনও উত্তর দিতে পারিতেছি না। যাহা করিয়াছি তাহা এমনি ব্যক্তিগত যে সেই আবেগ বুঝিবার ক্ষমতা এঁদের নাই। অন্যরকম ভাবিবেন।

গায়ক ফরেস্ট অফিসার সহসা বলিলেন, 'মনে হয় মাথায় একটু ছিট আছে।'

সাহেব তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তোমার বুঝি তাই মনে হচ্ছে!'

ভদ্রলোক থতমত হইয়া গেলেন। পাণ্ডুর মুখে সকলের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমি তাহলে যাই।'

সাহেব বলিলেন, 'অবশ্যই! তোমার তো অফিস আছে!'

তিনি বলিলেন, 'আমার কর্তব্য আমি করে গেলুম।'

'যে কোনো শিক্ষিত মানুষের তাইতো করা উচিত ঘোষাল। তোমার সার্ভিসবুকে এ-কথা আমি লিখব।'

'একটা কথা স্যার, অরুণা সারারাত জেগে আছে, এইবার একটু বিশ্রাম না নিলে ওর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাবে!'

'তুমি বলছ!'

'দেখছেন না, কী রকম ইমোশানালি আপসেট।'

'তুমি বুঝি ইমোশান পছন্দ করো না! জানোয়ারেরও ইমোশান আছে।'

ভদ্রলোক নির্বাক হইয়া হাঁটিতে লাগিলেন। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া হাঁটিতেছেন। দৃশ্যটি আমাকে আহত করিল! যে ফুল আমি তুলিব ভাবিয়াছিলাম, সেই ফুল অন্য কেহ তুলিয়া লইলে কেমন লাগিবে! অরুণার প্রতি ভদ্রলোকের আসক্তি জন্মিয়াছিল। প্রেম ক্রমশই দানা বাঁধিতেছিল। আমি কি করিব! রমণীর মন বোঝে কাহার সাধ্য। ঈশ্বরও হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সাহেব ইশারায় জানাইলেন, অবিলম্বে গাড়িতে উঠিয়া পড়। তোমার অতিশয় বাঁদরামিতে আমরা অতিষ্ঠ বোধ করিতেছি। গাড়ি তিনিই

চালাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। দুই কন্যা পিছনের আসনে। অরুণা পিতার পশ্চাতে, বড়দি আমার পিছনে। তাঁহার বামহস্ত আমার স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন। সেই হাত হইতে আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে। গাড়ি সগর্জনে বনানীর পথ চিরিয়া চলিতেছে। রাত্রি যেমন সুন্দর, প্রভাতও সেইরূপ সুন্দর। সদ্যোজাত একটি দিবস মহা হর্ষে কালের দোলনায় আলোছায়ার পোশাক পরিয়া দোল খাইতেছে।

বড়দি আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কী হয়েছিল কাল রাতে!'

আমি কী বলিব বুঝিতে না পারিয়া নীরব রহিলাম।

অরুণা কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের গলায় বলিল, 'কী আর হবে, নেশাভাঙ করে পড়েছিল কোথাও! বরাতে বাঘের পেটে যাওয়া লেখা আছে, কে ঠেকাবে!'

বড়দি বলিলেন, 'তুই বড্ড রেগে আছিস।'

অরুণা বলিল, 'রাগব না! সারাটা রাত আমরা জেগে বসে রইলুম। মায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার অবস্থা। প্রথমে ভাবলুম, বাবু সিগারেট খেতে গেছেন। ধোঁয়া ছেড়ে আসছেন। ও বাবা, এগারোটা বাজল, বারোটা বাজল। রাত কাবার।'

বড়দি বলিলেন, 'ভূতে ধরেছিল।'

তবু আমি কিছু বলিলাম না। বোবার শত্রু নাই। আমার একান্ত ব্যাপার। আমি গোপনেই রাখিব। আমার মস্তকের প্রকোষ্ঠে কিছু দুষ্ট বুদ্ধি আছে। ছাত্রাবস্থায় সেই বুদ্ধির জ্বালায় শিক্ষক মহাশয়রা অতিষ্ঠ হইতেন। সেই বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিল। মনে হইল, একটি রবীন্দ্রসংগীতে এই দুই কন্যার প্রশ্নের উত্তর আছে। অকস্মাৎ সেই গানটি ধরিলাম ঃ

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।।
যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে!
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে পাখির গানে আকাশ গেল পূরে,

সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে যতই প্রয়াস করি পরাণপনে—
যখন তুমি আছ আমার সনে॥

গানটি শেষ হওয়া মাত্র অরুণা বলিল, 'নির্লজ্জ এখনও গান গাইছে। গলায় এখনও গান আসছে!' বড়দি বলিলেন, 'ছেলেটা সত্যিই ভালো গায়। কাঠের কারবার না করে শুধু গান নিয়ে থাকলেই তো পারো!'

সাহেব বলিলেন, 'প্রোফেসানাল হয়ে গেলে গানে এই আবেগ আর থাকবে না।'

বাংলোর সামনে গাড়ি থামিল। নুড়ি বিছানো পথে নামিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে মা ছুটিয়া আসিলেন। আমার দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন। সেই দৃষ্টিতে স্নেহ, অভিমান, ক্রোধ সব মিশিয়া রহিয়াছে। এই পরিবারের সমস্ত মানুষ কোন ধাতুতে নির্মিত আমি বলিতে পারিব না। যে-কালে মাতা সন্তানকে হত্যা করিতেছে, স্বামী স্ত্রীকে পুড়াইয়া মারিতেছে, স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া স্বামীকে আর্সেনিক খাওয়াইয়া মারিতেছে, সর্বত্রই রক্তারক্তি কাণ্ড, সেইকালে অনাত্মীয় একটি ছেলের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালবাসা কেমন করিয়া আসিতেছে। সিদ্ধান্ত তাহা হইলে এই হইল, যে ভালোবাসিবে সে ভালোবাসিবেই। তাহার প্রকৃতিই এইরূপ। জল যেমন তরল, লৌহ যেমন কঠিন, কর্দম যেমন পিচ্ছিল, লঙ্কা যেমন কটু, আম্র যেমন মিষ্ট।

আমি তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তুমি আমাদের কথা ভাবো না। আমরা তোমার পর।' তিনি দ্রুত ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া, একেবারে রন্ধনশালায় গিয়া পৌঁছাইলাম। সব সৌজন্য দূরে রাখিয়া, পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, 'মা, আমার ভুল হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাগ জল হইয়া গেল। চুল খামচাইয়া ধরিয়া মাথা ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে বলিলেন, 'এই জঙ্গলে অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। কলকাতার ছেলে, জঙ্গলের তুই কী জানিস!' ছোলার ডালের ধোঁকা ভাজা হইতেছিল। আমার মুখে একটি সাঁদ করাইয়া দিলেন। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে কী কারণে মনে হইল, যাহাদের গেঁটে বাত আছে, তাহাদের কুমীরে ধরিয়া চর্বণ করিলে, এক সময় মরিয়া যাইবে ঠিকই; কিন্তু বড় আরামেই মরিবে।

দুই

দশটি শালিক একত্রে কচরমচর করিতেছিল। একটি বৃক্ষের শিকড়ে উপবেশন করিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। আর কিয়ৎক্ষণ পরেই নিলাম শুরু হইবে। বৃক্ষের ফাঁক দিয়া বন বিভাগের কার্যালয় দেখিতে পাইতেছি। উজ্জ্বল হলুদ রঙে রঞ্জিত। অনেকগুলি জিপ আসিয়াছে। নিলামে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই হইবে। আমার কৌশল সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি প্রথম দিকে দর হাঁকি না। ধৈর্য ধরিয়া থাকি। যে সর্বোচ্চ হাক ডাকিল, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল নিলাম শেষ, ঠিক তখনই পাঁচহাজার চড়াইয়া দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকি। দেখিয়াছি, শেষ হইতে আবার শুরু করিতে সকলেই ক্লান্তি অনুভব করেন।

বসিয়া বসিয়া শালিকের অনুরাগ, বিরাগের খেলা দেখিতেছি আর অরুণার কথা ভাবিতেছি। ভালোবাসা কী অপূর্ব অনুভূতি। মানুষকে কেমন যেন হনুমানের মতো করিয়া দেয়। অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিয়াছি, বেলা শেষে, উচ্চ বৃক্ষশাখে বসিয়া আছে উদাস হনুমান। বাঙলার পাঁচের মতো মুখটি অনিশ্চিতের দিকে তুলিয়া। কলা-মুলার ভাবনা দূরে ফেলিয়া, দীর্ঘ লাঙ্গুলটিকে রজ্জুর মতো নিম্নে ঝুলাইয়া দিয়া সীতার কথা ভাবিতেছে। ভালোবাসা বহুপ্রকার, সন্তানের মাতার প্রতি ভালোবাসা, কন্যার পিতার প্রতি ভালোবাসা, স্বামীর স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, জীবের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, প্রেমিকের প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসা। বৃষ্টির পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা, তটের প্রতি ঊর্মির ভালোবাসা। গোমাতার গোবৎসের প্রতি ভালোবাসা। তালিকাটি ক্রমশই বড় করিতে লাগিলাম। আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই সহজ অথচ ভয়ঙ্কর কথাটি আমি অরুণাকে কোনও দিনই বলিতে পারিব না। আমার লজ্জা করিবে। আমি এই অপ্রকাশিত ভাবটি লইয়া মরিয়া যাইব। তবে কাহারও তো জানা উচিত। আমি শিমূলকে বলিয়াছি, যাহার মূলে বসিয়া আছি। প্রেম, পবিত্র প্রেম একপ্রকার পূজাই। ওই দিকে ঝানু ব্যবসায়ীরা ব্যবসার কথায় মশগুল, আমি এইদিকে বসিয়া বসিয়া রবীন্দ্র গীত গুনগুণ করিতেছি ঃ

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতো রাজে।।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে

আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে॥

পশ্চাৎ হইতে পৃষ্ঠে একটি হাত আসিয়া পড়িল। চমকাইয়া তাকাইলাম। সেই গায়ক ফরেস্ট অফিসার। আমার পানে তাকাইয়া আছেন সদ্য স্বামীহারা বিধবার দৃষ্টিতে। আকাশের যেমন ভাষা নাই, সেইরূপ ভাষাহীন চোখে তাকাইয়া আছেন। আমি সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নিজের দু'হাতের মুঠায় আমার হাত দুটি ধরিয়া কহিলেন, 'তুমি সুখী হও।'

আমি বলিলাম, 'আমি তো সুখী-ই। আমার কোনও দুঃখ নেই।'

'তুমি আরও সুখী হও। তোমার কাছে আমি হেরে গেছি।'

'কোনও খেলা তো হচ্ছিল না। হার-জিতের কথা আসছে কী করে!'

'আসছে বই কী, আমি যে অরুণাকে ভালোবাসি। অরুণাকে পেতে চাই।'

'পেতে যখন চান, তখন অবশ্যই পাবেন। অরুণার বাবাকে বলুন।'

'বলা যায় না। তাঁর আন্ডারে আমি চাকরি করি।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'সে তুমি বুঝবে না। সার্ভিসে র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল আছে। আমি সাবঅর্ডিনেট, জাতে ছোট।'

'তাহলে অরুণাকে বলুন। সে তার বাবাকে বলবে।'

'অরুণা আমাকে ভালোবাসে না।'

'তাহলে তো ঝামেলা মিটেই গেল।'

'আমি চেষ্টা করছিলুম। আমার সেই চেষ্টাটা তুমি শেষ করে দিলে।'

'আজ বাদে কাল আমি তো চলেই যাবো; তখন তো ফাঁকা মাঠ। গোল দিন।'

অরুণা তোমাকে ভালোবেসেছে। তুমি যাবে কোথায়! যেখানেই যাও তুমি এইখানেই থাকবে।'

'শোনেন নি, আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড!'

'সে হলেও আমি আর অরুণাকে ভালোবাসতে পারব না। তার পা স্লিপ করেছে, মনে কাদা লেগে গেছে। ক্যারেক্টার নষ্ট হয়ে গেছে। পরপুরুষে আসক্ত হয়েছে। দ্বিচারিণী, ব্যাভিচারিণী, বিশ্রী।'

'ব্যাস, তাহলে তো মিটেই গেছে।'

'আমার কষ্টটা তুমি বুঝেছ? তুমি ভিলেন।'

'হিন্দী ছবির মতো আপনি আমাকে ঢিসুম ঢিসুম করে শেষ করে দিন। দিয়ে, নায়িকাকে নিয়ে প্রস্থান করুন।'

'মুশকিল হল, নায়িকা যে ভিলেনকে ভালোবেসে ফেলেছে।'

'তাহলে আপনি ভিলেন হয়ে যান।'

'সে আমি পারব না। আমার আলাদা মেক। আমি পরাজিত হব তবু ছোটলোক হতে পারব না। মেয়েরা খুব নিষ্ঠুর হয়। অরুণা খুব চালাক। আমার কত মাইনে অরুণা জানে; তোমার রোজগার আমার চেয়ে অনেক বেশি। তোমার চেহারা আমার চেয়ে অনেক ভালো। তাছাড়া, তবলার সঙ্গে আমি গান গাই না, তাই তুমি যখন বাজাচ্ছিলে, আমার দু-চার বার তাল কেটেছে। সেটা লক্ষ করে অরুণা ভুরু কুঁচকেছে। আর তুমি ঠুংরিটা গেয়ে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারলে। যাকে বলে, লাস্ট নেল ইন দি কফিন। তুমি সি সার্পে গান গাও। তারার পঞ্চমে অনায়াসে গলা চলে যায়। সেই জায়গায় আমি সি, তারার গান্ধার অবদি সহজে গলা যায়, মধ্যমে ঠেলেঠুলে তুলতে হয়। অরুণা আর কেন আমাকে ভালোবাসবে। কেউ রাজভোগ ফেলে গুজিয়া খাবে! বুঝতে পারছ ব্যাপারটা! অরুণার কোনো দোষ নেই, দোষ তোমার।'

আমার সহিত নাটকীয় কায়দায় করমর্দন করিয়া তিনি চলিয়া যাইতে গিয়াও থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও অভিশাপ দিবার ভঙ্গিতে বলিলেন, 'তুমি কী সুখী হবে! হবে না, হতে পারবে না। এই আমার শেষ কথা।' এইবার অরণ্যের পথ ধরিয়া তিনি সবেগে হাঁটিতে লাগিলেন।

আমি আবার শালিকের খেলা দেখিতে লাগিলাম। আমার আদৌ আনন্দ হইতেছে না, বিষণ্ণ বোধ করিতেছি অতিশয়। একবার মনে করিলাম, নিলামে যাইব না, পরক্ষণেই মনে হইল, এখানে আমি প্রেম করিতে আসি নাই, পিতার কার্যে আসিয়াছি। বর্তমানকে অবহেলা করিলে, ভবিষ্যৎ প্রতিশোধ লইতে দ্বিধা করিবে না। অশ্বের পশ্চাৎভাগ অতিশয় বিপজ্জনক। পশ্চাতে চাঁট ছুঁড়িলে বীরও কুপোকাত হইবে। সময় এক ধাবমান অশ্ব। পৃষ্ঠে চড়িয়া না থাকিলে ধ্বংস অনিবার্য। সময় এক ধাবমান অশ্ব। এই কথা আমাকে আমার পিতা শিখাইয়াছেন, যিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহার ভাগ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সহিত তুলনা করিলে আমি অপদার্থ। আমি গদিতে আরোহন করিয়াছি যুবরাজের মতো।

ইত্যাদি চিন্তা করিবামাত্র আমার আলস্য অন্তর্হিত হইল। বনবিভাগের কার্যালয়ের দিকে ছুটিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া নতুন এক খবর শুনিলাম, আদেশ আসিয়াছে, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে, নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদনের কারণে ভূমিক্ষয় হইতেছে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিতেছে, পৃথিবীর উত্তাপ বাড়িতেছে, অতএব আপাতত সব বন্ধ। সরকার নতুন কিছু ভাবিতেছেন। পরে জানা যাইবে। এই সংবাদে অনেকেই শঙ্কিত হইলেন। ব্যবসা কি তাহা হইলে লাটে উঠিবে! খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, জানালা, দরজা কিসে নির্মিত হইবে! আমার কিন্তু আনন্দ হইল। কনজারভেটার সাহেব আমাকে বৃক্ষ সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবিতে শিখাইয়াছেন। বৃক্ষছেদনও এক হত্যাকাণ্ড। ব্যবসা বন্ধ হইলে হইবে। কি করা যাইবে!

আনন্দে নাচিতে নাচিতে নিজের বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। অরুণা ও বড়দি বারান্দায় বসিয়া আছেন। অরুণা আমাকে দেখিয়া বলিল, 'আমি আসিনি। বড়দি এসেছে। আমাকে সঙ্গে এনেছে।'

আমি বলিলাম, 'আপনি এলে কোনো ক্ষতি হত কী!'

বড়দি হাসিলেন মাত্র। কোনো কথা বলিলেন না। দরজা খুলিয়া তাঁহাদের ভিতরে আসিতে বলিলাম। তাঁহারা প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, 'বেশ গোছগাছ করে রেখেছ তো!'

আমি যেখানেই যাই আমার সহিত একটি দোতারা থাকে। নির্জন রাতে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন, সেই সুযোগে আমি দোতারাটি বাজাইতে, বাজাইতে খানিক নৃত্য করিয়া লই। ইহাতে আমার মন ভালো থাকে। লালনের গান গাই। রবীন্দ্রনাথ কী সাধে তাঁহাকে পছন্দ করিতেন, 'দেখো রে দিন রজনী কোথা হইতে হয়। কোন পাকে দিন আসে ঘুরে, কোন পাকে রজনী যায়!'

অরুণা সেই দোতারাটি দেখিয়া অতিশয় উল্লসিত হইল। প্রশ্ন করিল, কোথা হইতে পাইলাম! বীরভূম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এক বাউল আমাকে বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন। বৃক্ষ পরিবেষ্টিত অরণ্যের কোথাও মুক্তাঞ্চল পাইলে, আমি দোতারা বাজাইয়া নাচিতে থাকি। ইহা শুনিয়া, অরুণা আনন্দে আটখানা হইয়া, আমার বক্ষদেশে একটি চাপড় মারিয়া, তাহার দিদির সম্মুখেই ঘোষণা করিল; এইজন্যেই আপনাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।'

বড়দিদি একটি তীর পরীক্ষা করিতেছিলেন। তীরটি এক বৃক্ষের কাণ্ডে প্রোথিত ছিল। আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম। মৃত্যুর দূত হইলেও কাব্যময়।

বড়দিদি বলিলেন, 'আবার ইচ্ছে কেন? এবার বেসেই ফেল না। ঝুলিয়ে রেখে লাভ কী!'

এই কথা শুনিয়া অরুণা তাহার দিদির পরিবর্তে আমাকেই আর একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, 'অসভ্য!' তাহার মুখমণ্ডলে আবীরের বর্ণ খেলা করিতেছে। অবদমিত হাস্যের উদ্ভাস। বড়দিদি যেন ছিপি বন্দুক, ফটাস ফটাস করিয়া কথা বলিতে পছন্দ করেন। অরুণার মতো আমারও যথেষ্ট লজ্জা হইল।

আমি বলিলাম, 'তাহলে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।'

বড়দিদি বলিলেন, 'আপাতত তাই করো, পরে মণ্ডা মিঠাই পাওনা রইল।'

ঘরের সংলগ্ন একটি প্যানট্রিতে সব আয়োজনই আছে। একটি প্রাইমাস স্টোভ। কেটলি, কাপ, ডিশ, চা, গুঁড়া দুধ সবই আছে। আমি স্টোভটি ধরাইবা মাত্রই, ফঁস করিয়া ক্রোধী শব্দ করিতে লাগিল। বিস্ফোরণের আশঙ্কা সদা সর্বদাই, কিন্তু মানুষ বিপদ লইয়া খেলা করিতে পছন্দ করে।

অরুণা আমাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া চায়ের জল চাপাইবে, আমি কোনোমতেই তাহা করিতে দিব না। কারণ স্টোভ যদি ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে আমি মরিব, অরুণাকে মরিতে দিব না। সে আমাকে সরাইবে, আমি তাহাকে আসিতে দিব না। ওই ঘরে বড়দিদি দোতারাটি লইয়া লাগ্‌ওমাগুম, লাগ্‌ওমাগুম করিতেছেন, যেন আমাদের সঙ্ঘর্ষের আবহসঙ্গীত। অরুণা ধ্যাততেরিকা বলিল, আমি বলিলাম, মহাজ্বালা। তাহার পর কী হইতে কী হইল, জল এতদূর গড়াইল যে, চায়ের জল পড়িয়া রহিল, আমরা সরিতে সরিতে দেয়ালের প্রান্তে আসিয়া অদ্ভুত ভাবে জড়াইয়া যাইলাম। সর্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। জীবন্ত, উষ্ণ এক রমণী আমার বক্ষলগ্ন। তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস আমার কণ্ঠকূপ স্পর্শ করিতেছে। আমি পাপ করিতেছি, আমি অতিশয় অন্যায় করিতেছি। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। বড়দি আসিয়া পড়িলে সর্বনাশ হইবে। প্রাইমাস স্টোভ বলিষ্ঠ দৈত্যের ন্যায় ফুঁসিতেছে। অরুণা মুখ তুলিয়া ডাগর নয়নে আমার পানে নায়িকার মতো তাকাইয়া আছে। ইহা কী সাগর, ইহা কী আকাশ, ইহা কী তুষার প্রান্তর, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কোথা হইতে রামায়ণের দুই চরণ শ্লোক মনের প্রকোষ্ঠে পক্ষ ঝাপটাইয়া উড়িতে লাগিল। শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া বাল্মীকির কণ্ঠ হইতে যাহা অনায়াসে, অতিচকিতে নিঃসৃত হইয়াছিল ঃ

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমধবীঃ কামমোহিতম॥

কেন মনে হইল এমন চরণ দুটি। আমি কামমোহিত ও এই মুহূর্তে শরবিদ্ধ।

অরুণা অতঃপর আমার বক্ষদেশে অঙ্গুলির টোকা মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল, 'কেন তুমি আমাকে চা করতে দেবে না! বলো, কেন দেবে না?'

'আরে বোকা স্টোভটা যদি ফেটে যায়!'

'ফাটলে তো তুমি মরবে!'

'আমি মরি মরবো, তুমি মরলে আমি ডবল মরবো।'

বড়দি চিৎকার ছাড়িলেন, 'চা কী দার্জিলিং থেকে আসবে!'

এই ঘটনার তিন দিন পরে কনজারভেটার সাহেব বাগানের কাজ করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, 'শুনেছ বোধ হয়, আমার ছোট মেয়ে এক কাণ্ড করেছে।'

আমি মাটি হইতে কাঁকর বাছিতেছিলাম। মহাশঙ্কায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কী করেছে?'

তিনি অক্লেশে বলিলেন, 'প্রেম করেছে।'

আমি অধোবদন হইলাম।

তিনি পুনরায় বলিলেন, 'প্রেমের পর কী, তোমার জানা আছে কী?'

আমি তিনবার আজ্ঞে, আজ্ঞে করিলাম।

তিনি বলিলেন, 'বিবাহ। যার সঙ্গে প্রেম হয়, তার সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়। এটা জানো না?'

'জানি আজ্ঞে।'

'তাহলে চুপ করে আছ কেন?' উত্তর করিতে পারিলাম না। পালাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

তিনি বলিলেন, 'আমি কলকাতা যাবো।'

আমি নিরুত্তর।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'কেন যাবো?'

'নিশ্চয়, বিশেষ কোনো কাজ আছে।'

'বাঃ, ধরেছ ঠিক। বুদ্ধি আছে। কাজটা কী?'

আমি নিরুত্তর।

তিনি বলিলেন, 'থেকে থেকে বোবা হয়ে যাও কেন?'

এইবার আমি উঠিয়া এক দৌড় মারিলাম। তিনি হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অ্যালসেসিয়ানটি খেলা ভাবিয়া আমাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিতে লাগিল। তাহার সহিত আমার অতিশয় সখ্যতা জন্মিয়াছে। আমি যতই ছুটিতেছি, ততই আনন্দ হইতেছে। সদ্যোজাত গোবৎসের ন্যায় মনে হইতেছে।

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

আমার মতো করিয়া আমারই একটি উপলব্ধি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাহা হইল, ভূমির আকাশ-প্রেম বৃক্ষ হইয়া ঊর্ধ্বমুখী হইতেছে প্রতিনিয়ত। আকাশকে ভালোবাসে বলিয়াই পাখির পক্ষ নির্গত হয়। ফুলকে ভালবাসে বলিয়াই প্রজাপতি বহুবর্ণ। এই অরণ্যে আসিলে বোঝা যায়, এই পৃথিবী ভালোবাসার। প্রেমের পৃথিবী।

ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি॥

রাত্রি আসিল। নির্জন বনস্থলীতে দুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। আমরা আহার করিতেছিলাম। সকলেই সচকিত হইলাম। একালে শিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলে কে কাহাকে গুলি করিল! কনজারভেটার সাহেব আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। জিপ গাড়ি বাহির হইল। হেডলাইট জ্বালাইয়া শব্দ যেদিক হইতে আসিয়াছে আমরা সেইদিকেই চলিলাম। বনবিভাগের কর্মীদের আবাসস্থলের সম্মুখভাগে কয়েকজন দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা নামিলাম। সেই গায়ক ফরেস্ট অফিসার নিজেকেই নিজে হত্যা করিয়াছেন।

তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ। খোলা বাতায়ন পথে অভ্যন্তর ভাগ দেখা যাইতেছে। খাইবার টেবিলে পরিবেশিত আহার্য সকল। উজ্জ্বল আলোকে কক্ষ উদ্ভাসিত। বেতারযন্ত্রটি চলিতেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপ হইতেছে দরবারী রাগে। ফরেস্ট অফিসারের দেহটি বামপার্শ্বে হেলিয়া আছে। শুভ্র পাঞ্জাবির দক্ষিণ পার্শ্ব রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। এই আত্মহত্যার সাক্ষী স্বরূপ কক্ষের এক কোণে তম্বুরাটি দণ্ডায়মান। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইতেছে তখন পুলিস আসিল। ভদ্রলোক লিখিয়া গিয়াছেন, 'আমি পাগল। আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন, তাই বিদায় নিচ্ছি পৃথিবী

থেকে। এই দেহ দাহ না করে এই অরণ্যেরই কোথাও যেন সমাহিত করা হয়। আমার তানপুরাটি যেন পাশে থাকে। এই আমার শেষ ইচ্ছা। চির বিদায়।'

বনভূমিতে দীর্ঘকাল পরে একটি নাটক হইয়া গেল। আত্মীয়-স্বজনেরা আসিলেন। একটি মহুয়া বৃক্ষতলে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা মতো তাঁহাকে সমাহিত করা হইল। অরুণা কয়েক দিবস গুম মারিয়া রহিল। সে যে কাহারও মৃত্যুর কারণ হইতে পারে এমন ধারণা তাহার ছিল না। আমি আমার মনের খাতায় লিখিলাম, সাগরকে ভালোবাসিলে সকল নদীরই মৃত্যু হইবে। আগুনকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে পতঙ্গকে দগ্ধ হইয়া মরিতেই হইবে! রবীন্দ্রনাথ কী সর্বজ্ঞ ছিলেন। তাই কী লিখিলেন,

হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লুব্ধ করে, মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়।।

—আমার ফিরিবার দিন আসিয়া গেল। কনজারভেটার সাহেব বলিলেন, আমার সহিত তিনিও যাইবেন। কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে আমার পিতা অতিশয় সুখ্যাত ব্যক্তি। যোগেনদা বলিলে সকলেই এক বাক্যে চিনিবেন। প্রবীণ হইয়াছেন যথেষ্ট; কিন্তু জনহিতকর কার্যে তাঁহার ক্লান্তি নাই। অর্থ উপার্জন করেন, পরার্থে অকাতরে ব্যয় করেন! যৌবনে দেহচর্চা করিয়াছেন, দাঙ্গার সময় মুক্ত তরবারি লইয়া স্বজাতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। পরিপূর্ণ একটি জীবনের অধিকারী। একটি বৃহৎ দুঃখ পাইয়াছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে। তিনি আমার পিতার চরিত্রের সমস্ত গুণই পাইয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে দ্বিতীয় যোগেন। যেমন সাহসী, তেমনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কৃতী ছাত্র ছিলেন। পথ-দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনদীপ এক ফুৎকারে নির্বাপিত হইল। সেই নিদারুণ আঘাত আমার মাতা আজও সামলাইতে পারেন নাই। মাত্র সাতদিন পরে আমার দাদার বিবাহ হইবার কথা। পরিবার সেই আয়োজনে মাতিয়া ছিল। এমন সময় সংবাদ আসিল। আমরা হাসপাতালে ছুটিলাম। বধূবরণ না করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া আনিলাম। আমার মাতা জানাইলেন, আমার বিবাহের কথা কখনো উত্থাপন করিবেন না। যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন, গৃহে বিবাহের কোনো অনুষ্ঠান হইবে না।

সেদিন অপরাহ্নবেলায় কনজারভেটার সাহেব আমাদের গৃহে উপস্থিত

হইলেন। আমার পিতা মানুষকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সুখ্যাত। আন্তরিকতায় শত্রুকেও মিত্র করিতে পারেন নিমেষে। এক্ষেত্রে তাহাই হইল, বরং অধিক হইল। সাহেব এমতো অভিভূত হইলেন যে পদমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন। সেই অবস্থায় সাহেব বলিলেন, 'আজ থেকে আমরা বেয়াই হলুম।' পিতা বলিলেন, 'কী সৌভাগ্য!'

আমাদের গৃহটি অতিশয় আকর্ষণীয়। বৈভব আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই। আমার মাতা মা লক্ষ্মীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। পিতার সেবা ও কর্মযোগ বেদী রচনা করিয়াছে। কনজারভেটার সাহেব মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন, তাঁহার কন্যার আবাসস্থলটি উত্তম। আমার মাতার প্রতিজ্ঞার সহিত একটি রফা হইল। তাঁহার আপত্তির কোনও কারণ নাই, কারণ বিবাহ হইবে উত্তরবঙ্গে। এই গৃহ হইতে হইবে না।

এই সময় আমার মনে হইল, আমার ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। দাদার মতো আমাকে অপঘাতে মরিতে হইবে না; কারণ আমার জন্য একজন প্রাণ দিয়াছেন। সেই কথাটি আমি বলিতে পারিলাম না। পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি মনে ঘুরপাক খাইয়া গেল, 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে,/মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥'

চাপা একটি উৎসবের পরিবেশ চেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা গেল না। গিল্টি করা ফ্রেমে দাদার বৃহৎ চিত্রখানি দেয়ালে প্রলম্বিত। ঠোঁটের কোণে অমলিন, মৃত্যুঞ্জয়ী হাসিখানি। আয়ত দুইটি চক্ষু। রাত যত বাড়িতে থাকে ছবিখানি ততই জীবন্ত হইতে থাকে। আমার দিকে তাকাইয়া দাদা যেন বলিতে থাকে, আমার যতটুকু ছিল ততটুকু ভোগ করিয়াছি। জীবনের দিন মুদ্রার মতো, সঙ্গে যাহা আনিয়াছিলাম তাহা খরচ করিয়াছি। ইহাই আমাদের নিয়তি। দুঃখ করিও না। জীবন তোমাকে যাহা দিতেছে তাহা গ্রহণ করো। গ্রহণ করিবার সময় স্মরণে রাখিয়ো, গ্রহণ থাকিলেই বর্জনও থাকিবে। মনের দুয়ার উন্মুক্ত রাখিও।

সাহেব একটি বাংলো আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরণ্যক পরিবেশে আমার মাতা অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, সুযোগ পাইলে এই স্থলে আসিয়া থাকিবেন। বিবাহের রাত্রে অরুণাদের গৃহটি আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। পুষ্পের অপ্রাচুর্য ছিল না। চারিপার্শ্বে নিস্তব্ধ অরণ্য। বৃহৎ

বৃহৎ বৃক্ষ। তাহারই অন্তরালে আলোকের শোভা। শুষ্ক আবহাওয়া। অল্প শীতল বাতাস। পুষ্পের সুগন্ধ। লগ্ন পড়িয়াছিল অধিক রাত্রে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহে পরিধান করিবেন বলিয়া পিতা একটি মুগার পাঞ্জাবি করাইয়াছিলেন, সেই পাঞ্জাবিটি পরিয়াছেন। তাঁহাকে সুন্দর দেখাইতেছে। মুখের ভাব দেখিয়া অনুমান করিতে পারিতেছি, হর্ষের মাঝেও বিষাদের ছায়া। স্মৃতি সহজে মুছিবার নহে। আমার মাতা অলক্ষ্যে রোদন করিয়াছেন। আমি তাহা জানি।

শঙ্খের শব্দ ও উলুধ্বনিতে বনস্থলী কম্পিত হইল। যে কয়েকজন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ও আত্মীয় পরিজনদের হই হট্টগোল একসময় শান্ত হইল। আমার পিতা ও শ্বশ্রূমহাশয় জোট বাঁধিয়াছেন। আমার মাতাকে আমার শ্বশ্রূমাতা জড়াইয়া ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। মেজদি আমাকে কটূকথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। বড়দি আমার কর্ণমর্দন করিয়া বলিলেন, 'এই তোমার পুরস্কার। আমি একটু শোবার জায়গা খুঁজি এইবার।' তিনিও চলিয়া গেলেন। আমি আর অরুণা বাসর জাগিতেছি।

এই সেই কক্ষ। সেই রাত্রে এই কক্ষেই সঙ্গীতের আসর বসিয়াছিল। আমি তবলা বাজাইতেছিলাম। তিনি গান গাহিতেছিলেন। আমি বাদ্যে তাঁহাকে হারাইতে চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে হারাইয়া দিলেন। কক্ষের তিনটি গবাক্ষ উন্মুক্ত। একটি অরণ্যের দিকে। উৎসব মরিয়া গিয়াছে। ভারি নিদ্রা প্রায় সকলের উপরেই চাপিয়া বসিয়াছে। বাতাস বৃক্ষপত্র লইয়া খেলা করিতেছে। পেঁচকের কর্কশ চিৎকার। অরণ্যের দিকের গবাক্ষে যতবার দৃষ্টি পড়িতেছে, মনে হইতেছে পরিচিত একটি মুখ সরিয়া গেল। যতবার তাকাইলাম ততবারই এক দর্শন। একটি মুখের ঝটিতি তিরোধান।

আমার ভয় নাই, তবু আমি ভীত হইলাম। ভাবিলাম, তবে কী তিনি মরেন নাই। অথবা সমাধি হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। নিমন্ত্রিতদেরই একজন! উপবাসক্লান্ত দেহে অরুণা ঢুলিতেছিল। আমি ভয় পাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শরীর আঁকিয়াবাঁকিয়া গেল। দুই হস্তদ্বারা আমাকে দূরে সরাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, 'সুড়সুড়ি লাগে সুড়সুড়ি।'

আমার ভূতের ভয় চলিয়া গেল। মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। মহা লজ্জা। কেহই হয়তো ছুটিয়া আসিবেন না; কিন্তু ভাবিবেন, ছেলেটি ইতর, অসংযমী। বিবাহের রাত্রেই স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে চাহিতেছে। একেই আমি অপরাধ বোধে

ভুগিতেছি, গবাক্ষে মৃত ব্যক্তির মুখ একবার নহে, বারে বারে দেখিয়াছি, তাহার উপর এই লজ্জার বোধ। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে একটি চুম্বন করিয়াছিলাম, তখন কাতুকুতু বোধ করে নাই।

রাগ হইল। কক্ষ ত্যাগ করিলাম। বাসরে আমার প্রয়োজন নাই। ভোরের আলো ফুটিতেছে। উৎসবের রাত বিদায় লইল। মালাগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথাও একটি দাঁড়কাক তাহার লৌহ চঞ্চুতে কর্কশ শব্দ তুলিয়া রাত্রিকে বহিষ্কারের আদেশ দিতেছে। আলোগুলি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

আমি বাহিরে আসিয়া আমার বরের বেশেই হাঁটিতে লাগিলাম। কে যেন আমাকে টানিতেছে। চলিতে চলিতে আমি সেই স্থলে আসিলাম। যেখানে একটি মহুয়া বৃক্ষের তলে এক বৃর্থ প্রেমিক চিরনিদ্রায় শায়িত। কিন্তু কী দেখিতেছি! এক রমণী সেই সমাধির বেদীতে একটি পুষ্পস্তবক রাখিয়া ভোরের আলোয় ভৈরবী রাগিণীর মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সন্নিকটে গেলাম। দেখিলাম, বড়দি। আমাকে দেখিয়া লজ্জা পাইলেন। দুই চক্ষে অশ্রু টলটল করিতেছে। সেই দৃশ্যে আমিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। দুঃখ লজ্জার ব্যবধান দূর করিয়া দিল। তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। সংযত হইয়া বলিলেন। 'কথা দাও, যা দেখলে তা কারোকে বলবে না।'

'কথা দিলুম।' রুদ্ধ আমার কণ্ঠস্বর।

'এই ছেলেটিকে আমিই ভালোবেসেছিলুম। অরুণার কথা ভেবে স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। তা ছাড়া বয়সে আমি কিছু বড়। যদি বলতে পারতুম, মানুষটাকে এইভাবে মরতে হত না। মানুষটা ভারি প্রেমিক ছিল। এটা আমার গোপন কথা। শুধু তুমিই জানলে। তুমি চলে যাও। আমি পরে আসছি।'

বনপথ ধরিয়া ফিরিয়া আসিলাম হৃদয়ে একটি রত্ন লইয়া, তাহার নাম প্রেম। বড়দির আপাত রুক্ষতা, পুরুষ বিদ্বেষ, অর্জিত জ্ঞান ও মনোবিদ্যার অন্তরালে একটি হৃদয় আছে। সে হৃদয় হীরক নির্মিত। কেহ জানে না। আমি জানি। তিনি ভোরের ভৈরবী।

আমি অতীতে গিয়াছিলাম। বর্তমানে ফিরিয়া আসি। আমার অরণ্যদেব শ্বশুরমহাশয় অবসর গ্রহণের পর লবণহ্রদে বড়লোকি করিতে গিয়া বিপাকে পড়িয়াছিলেন। অবশেষে গ্রামের পূর্বে বন দেখিয়া বনগ্রামে আসিয়া স্থিত হইয়াছেন। ইছামতীর পরপারেই সুন্দরবন। ব্যাঘ্র থাকিলেও থাকিতে পারে।

অরণ্যদেব স্মৃতি রোমন্থন করিয়া বাঁচিতে পছন্দ করেন না। প্রতি মুহূর্তে স্মৃতি রচনা করিতে চাহেন। আমার পিতৃদেব পরলোকে। অরণ্যদেবই এখন আমার আদর্শ ও আশ্রয়।

সমস্ত সংবাদপত্র একটানে একপাশে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার শুরু হইবে তাঁহার মজদুরি। এমন দিলখোলা, পরিশ্রমী মানুষ আমি কমই দেখিয়াছি। ভিতর হইতে বড়দি ডাকিলেন, 'মহিষাসুর।' কচুরি পরিপাকের জন্য আমার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া রাখিয়াছেন।

চেয়ারের উপর টুল চড়াইলাম, তাহার উপর টলবল, টলবল করিতে করিতে দাঁড়াইলাম। টুলের পায়া দুটি বড়দি ধরিয়া আছেন, পাছে পড়িয়া যাই। সম্মুখের র‍্যাকে অনন্ত পুস্তকরাশি। সবই মনস্তত্ব। মানুষের মনের খবরে ঠাসা।

সেই টুলের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আমি দুহাত তুলিয়া রবীন্দ্রনাথেরই একটি গান ধরিলাম ঃ

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা॥

এতক্ষণে অরুণার কণ্ঠস্বর পাইলাম, 'খেপা খেপেছে।' তাহার কাতুকুতুরোগ সারাইতে আমাকে যথেষ্ট কসরত করিতে হইয়াছিল। সোহাগ করিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিলেই খিল খিল। কক্ষ পার্শ্বেই পিতামাতার অবস্থান। গভীর ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া আমার এই হইল, সারা জীবন পাশবালিশ আলিঙ্গন করিয়াই আমাকে কাটাইতে হইবে। অদ্ভুত পরামর্শ দিয়াছিল, চোরেরা স্প্রে করিয়া গৃহস্থদের ঘুম পাড়াইয়া সর্বস্ব হরণ করে। আমি যেন তাহাই করি।

এই টুলে দাঁড়াইয়া সানন্দে সংবাদ দিতেছি, অরুণা মা হইবে। আজ তাহার সাধভক্ষণ।

বড়দি সাবধান করিলেন, 'পড়ে মোরো না।'

আমি বলিলাম, 'আই লাভ ইউ।' আমার হস্তে এরিক ফ্রোমের একটি বই, 'দি আর্ট অফ লাভিং।'

বড়দি বলিলেন, 'মারবো এক চড়।'